রূপসী বালুরেখা

বাণীকুমার দেব

সোমনাথ প্রকাশনী
১০, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা—৯

প্রকাশক :
সোমনাথ প্রকাশনী
১০, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ :- রাসযাত্রা নভেম্বর ১৯৬১

প্রচ্ছদ :
অঞ্জন ঘোষ

মুদ্রাকর :
দি বি, জি, প্রিন্টার্স
১৯/ই, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

রূপসী বালুরেখা

…মেয়েলি কণ্ঠের একটা ডাক শুনতে পাওয়া গেলো হঠাৎ—'এই রিকশাওয়ালা, দাঁড়াও।'

রূপক দাঁড়ালো বাড়িটির সামনে।

দেখলো বিরাট বাড়ি। উঁচু গেট। সামনে বাগান। বাগানে ফুটে আছে নানা রকমের ফুল। থোকা থোকা লালরঙা রঙ্গন, সাদা সাদা বড় বড় টগর, চন্দ্রমল্লিকা, আকাশমমি, নয়নতারা, মোসাণ্ডা ইত্যাদি।

দোতলার বারান্দা থেকে মেয়েটি ডাকছিলো। নাম মলি। মলিশংকর রায়, ধীরেনশংকর রায়ের একমাত্র কন্যা। বটল্ গ্রীণ রঙের শাড়ি পরা মেয়েটি। ম্যাচকরা ব্লাউজ। পিঠে একরাশ কালো চুলের লম্বা বিনুনী। গায়ের রঙ বেশ ঝক্‌ঝকে ফর্সা। বয়স চব্বিশের মধ্যে।

একটু পরেই মেয়েটি তর্‌তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো এবং বাগান পার হয়ে রিকশায় এসে উঠে বসলো।

বসেই বললো—ব্বাঃ, বেশ ঝক্‌ঝকে নতুন রিকশাটি তো তোমার! তারপর কিছুক্ষণ থ হয়ে তাকিয়ে রইলো রিকশাওয়ালার সুন্দর উজ্জ্বল স্বাস্থ্য ও ভদ্রোচিত চেহারার দিকে।

পরে চোখ ফিরিয়ে বললো—ওই যে মোড়ে চানাচুর ভাজার দোকানটা দেখা যাচ্ছে না, সেখানে নিয়ে চলো আমায়। চানাচুর কিনবো। দেখছোনা আকাশটা কিরকম মেঘলা! গাছের পাতায় হাওয়ার দুলুনি। বৃষ্টি এলো বলে!

রূপক ভেবেই পেলো না এই এতোটুকু পথের জন্য আবার রিকশা কেন!

কিন্তু রূপক তো জানে না অর্থবান লোকেদের এরকম কত শত সখ থাকে।

সাইকেল রিকশাটি ক্রিং ক্রিং শব্দ করে চললো। হাওয়ার সাথে সাথে মেয়েটির গায়ের এসেন্সের গন্ধ ভাসলো।

মোড়ে গিয়ে রিকশায় বসেই রূপককে দিয়ে দু'টাকার ভালো চানাচুর কিনলো মেয়েটি।

এদিকে আকাশ আরও কালো হচ্ছে। মেঘের দু-একটা গুরু গুরু আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি নামলো রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ শব্দ করে।

রূপক বললো—রিকশার ঢাকনাটা উঠিয়ে দিই দিদিমনি?

না।

ভিজে যাবেন যে!

ভিজতে আমার ভালো লাগে যে। তুমি বরং আস্তে আস্তে রিকশা চালাও, যাতে আমি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ভিজতে পারি।......

এর পর দেখা যাক, রিকশাওয়ালা রূপক আস্তে আস্তে রিকশা চালাতে চালাতে ও বড়লোকের মেয়ে মলি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এ গল্পে কতটুকুন পর্যন্ত যেতে পারে।

*   *   *   *

এক

একদিন দেখা গেলো এক যুবক বরানগরের এক নির্জন পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে। হাবভাবে বোঝা যাচ্ছে যুবকটি লেখা পড়া জানে। বয়স সাতাশ-আটাশ হবে। দেখতে সুশ্রী। উজ্জ্বল স্বাস্থ্য।

যুবক চল্‌ছে তো চলছেই। মাঝে মাঝে এদিক সেদিক দেখছে। দু'একটা মোটরের হর্নও তার কানে আসছে। যুবক ডান দিকে বাঁক নিয়ে এবার অপেক্ষাকৃত একটা ছোট রাস্তায় ঢুকলো।

কিছুদূর গিয়ে দেখলো বিভিন্ন ভাষা-ভাষির কিছু লোক একত্রে বসে জটলা করছে। আর দেখলো পাশেই বেশ কয়েকটি সাইকেল রিকশা রাখা আছে। কোনটা নতুন, কোনটা পুরনো, কোনটা বা ভাঙ্গা ঝর্‌ঝরে।

যুবক বুঝলো এটা একটা রিকশার গ্যারেজ এবং মেরামতির কারখানাও বটে। আর এরা সবাই রিকশাওয়ালা। রিকশা চালিয়ে চলে রুজি রোজগার। খেয়েদেয়ে, হেসে, গান গেয়ে, গল্প করে কেটে যায় তাদের জীবন।

হঠাৎ যুবকটি একজনকে জিজ্ঞেস করলো—রিকশা চালিয়ে তোমরা রোজ কত পাও বলো না?

লোকগুলি আশ্চর্য হলেও সবাই একসঙ্গে কাড়াকাড়ি করেই যেন উত্তর দিতে ব্যগ্র হয়ে উঠলো।

প্রথমজন বাঙ্গালী, নাম রঞ্জু। বললো—পনের বিশ টাকার মতন হয়।

দ্বিতীয়জন হিন্দুস্থানী। নাম লছমন, সে বললো—পনর বিশ রূপিয়াই হোতা হ্যায়। সাচ্‌ বাত্‌।

তৃতীয় জন ওড়িয়া। নাম গোবিন্দ। সে বললো—পন্দর কোড়িএ টঙ্কা। পরভুজগরনাথঃ। এবং বলেই জগন্নাথ দেবের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে কপালে ঠেকালো।

চতুর্থ বাঙ্গালীটির নাম বীতেশ। সে সব সময়েই কথা একটু

বাড়িয়ে একটু ব্যাখ্যা করে বলে। সেও বললো—পনের বিশ টাকার মতোই হবে। কোন কোন দিন একুশ বাইশ টাকার মতোও হয়। তবে হ্যাঁ, সারাদিন রিকশা চালানো বাবদ একটা খাই খরচা আছে তো, তা বাদ দিতে হবে। এই ধরুন তিন চার টাকা বাদ যাবে আর কি। আর একটু না কষে যদি রসে বসে মানে রস করে খরচা করেন—বুঝলেন কিনা—তবে পাঁচ ছয় টাকাও বাদ যেতে পারে। তখনই ফ্যাসাদ——।

এমন সময় রঞ্জু বলে উঠলো—এই 'প্রেফেসার', একদম মুখ চাপা দে।

আর এমনি বীতেশ মুখখানা বড় করে হাঁ করে ডান হাত দিয়ে মুখ চাপা দিল এবং একেবারে চুপ মেরে গেলো।

এই 'প্রেফেসার' বলার একটু ইতিহাস আছে। রঞ্জু মাঝে মাঝে বীতেশকে 'প্রেফেসার' বা 'বীটুকে' বলে ডাকে। কারণ বীতেশ একটু ওদের চেয়ে বেশী লেখাপড়া জানে এবং বড় হয়ে সে প্রফেসার হবে বলে ছোট বেলায় স্বপ্ন দেখতো।

আচ্ছা রিকৃশা বাবদ তোমাদের কতো জমা দিতে হয়? যুবক বললো একটু ইতস্ততঃ করে।

রঞ্জু বললো—এই চার টাকা পাঁচ টাকার মতো।

সঙ্গে সঙ্গে লছমন বললো—সাচ্ বাত।

গোবিন্দ বললো—পরভুজগরনাথঃ। এবং সাথে সাথেই হাত জোড় করে কপালে ঠেকালো।

কিন্তু বীতেশ মাথা চুলকে বললো—নোট মানে টাকার নোট আর কি, ময়লা হলে কিন্তু মালিক সহজে নিতে চায়না। তখন আবার ফ্যাসাদ।

'এ-ব্বে বীটুকে'—রঞ্জু মস্তানী ও মুরুব্বিয়ানার সুরে বললো। বীটুকে ওরফে প্রেফেসার ওরফে বীতেশ সংগে সংগে চুপ এবং বড় করে একটা হাঁ করে হাত চাপা দিলো মুখে।

যুবকটি আজ মরিয়া। তার একটা কিছু অবলম্বন আজ চাই-ই।

হঠাৎ যুবক বললো—আমাকে একটি রিকশা যোগাড় করে দিতে পারবে?

কেন? আশ্চার্য হয়ে বললো রঞ্জু।

আমি চালাবো।

চমকে ওঠে লছমন বললো—আপ্ সেকেগা? সাচ্ বাত! আপনি এইটা করি পারিবে নাহি। জগরনাথঃ। বললো গোবিন্দ হেসে, আর কপালেও হাত ঠেকালো যথারীতি।

প্রথমটায় রীতেশ শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল যুবকের দিকে। তারপর বেশ ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে বললো—ইউ ক্যান্ নট ব্রাদার।

একটু ভেবে রঞ্জু বললো। আপনি লেখাপড়া জানেন, বাবুলোক, আপনি এসব পারবেন না।

যুবক দৃঢ়স্বরে বললো—আমি নিশ্চয়ই পারবো। আমি ছ'মাস ট্যাক্সি ঝাড়পোছ করেছি। পাঁচ মাস দূরপাল্লার ফেরিতে ক্লিনারের কাজ করেছি, লরির পাঞ্জাবী ড্রাইভারের কল্যাণে একসেলেটার, ব্রেককষা, ফার্ষ্ট গিয়ারে কিছুটা চালাতেও শিখেছিলাম। ব্যস, এই পর্যন্তই। একমাত্র লেখার কাজ করেছি একটা হোটেলে নামমাত্র পয়সায়। আর যা যা কাজ করেছি দীর্ঘদিন তার ফিরিস্তি দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু তার বিনিময়ে মালিকরা যা পয়সা দিচ্ছিলো তাতে আমার কিছুতেই চলছিলোনা। কিছুতেই না। আমার দেহ যথেষ্ট মজবুত। দেখছো হাতের পেশী, বুকের ছাতি? রীতিমত কসরৎ করে তৈরী করা শরীর। জুডো, কুং-ফু, ক্যারাটে, টেপাকল টিপা ইত্যাদি ইত্যাদিও কিছুটা জানি। আমি পারবো না মানে? নিশ্চয়ই পারবো। তাছাড়া কোন কাজকেই আমি ছোট মনে করিনা।

একটু থেমে সামান্য দম নিয়ে যুবকটি প্রায় চেঁচিয়েই বললো—জানো, বর্তমানে আমি একজন অসহ্য যন্ত্রণাময় বেকার, স্রেফ্ বেকার।

আমি রিকশা চালিয়েই স্বাধীনভাবে রুজি রোজগার করবো। তাতে বেশী গায়ে খাটলে দু'টো পয়সাও তো বেশী পাবো। পরের চাকরী আর করবো না—গোলামীগিরিতে গেন্না ধরে গেছে। যে চাকরীতে দু'টি প্রাণীরও পেট ভরে না, কি দরকার সে চাকুরীর? শেষের কথাগুলির সময় তার চোখ মুখ হতে ঠিক্‌রে বেরোচ্ছিলো একটা তীব্র অবজ্ঞা ও ঘৃণা। যুবকটির চিৎকার ও দৃঢ়প্রত্যয় দেখে রিকশাওয়ালারা কেমন ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে গেলো। তারা আর কোন আপত্তি করলো না এবং রঞ্জুই বললো—বেশ, কাল সকালে আসবেন। আমরা রিকশার ব্যবস্থা করে দেবো।

যুবকটি বেরোতে যাবে এমন সময় কয়েকটা পট্‌কা ও বোমার আওয়াজ শোনা গেলো। রাস্তার দিকে লোকজনের ছোটাছুটিও দেখা গেলো।

বীতেশ চেঁচিয়ে বলে উঠলো—বেরোবেন না দাদা, বেরোবেন না। টবিন রোডের দিকটায় বোধহয় আবার গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেলো।

যুবকটি থমকে দাঁড়ালো ও একটা তক্তার উপর বসে পড়লো।

পটকা ছুরি বোমা পিস্তল গণ্ডগোল খুন জখম এখন অনেকেরই গা সহা হয়ে গেছে। বর্তমানের বিশৃঙ্খল এই সমাজ চিত্রের সাথে রূপকও পরিচিত।

রঞ্জু রাস্তার দিকে একটু মুখ বাড়িয়ে বললো—এ যেনো শালা কলকাতার রোজকার ঘটনা। বোমা না ফাটালে যেন বেটাদের ঘুমই আসবে না। আর বলবই বা কি, মার দাঙ্গা যেন সারা দেশে লেগেই আছে। গণ্ডগোল শুরু হলো ত রিক্‌শাও বন্ধ্। রুজি রোজগারও খতম্।

বেটারা লড়বিতো ময়দানমে গিয়ে লড়না। রাস্তায় কেন লোকদের অসুবিদা করে। বিরক্তির সংগে বললো লছমন।

আরও একটু অপেক্ষা করার পর, কাল সকালেই ফের আসবে বলে, যুবকটি রাস্তার দিকে পা বাড়ালো।

দুই

যুবকটির নাম রূপক। রূপক দত্ত। রিকশা চালাচ্ছে রূপক। রুজি রোজগার হচ্ছে মন্দ নয়। নতুন ধরনের অভিজ্ঞতাও হচ্ছে। নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা। কেউ পয়সা মেরে দিচ্ছে, কেউ রিকশায় উঠে ঝগড়া করছে। কোন কোন মাতাল রিকশার ভাড়ায় দাম বনিবনা না হলে অশ্লীল গালাগালিও দিচ্ছে।

আবার কোন বড়লোকের ছেলে বিরাট বাড়ীর সামনে নেমেই, ভাড়ার টাকাটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে গট্‌গট্‌ করে জুতোর আওয়াজ তুলে ভেতরে চলে যাচ্ছে। বুঝিয়েই যেন দিয়ে যাচ্ছে, তার প্রাইভেটটা হঠাৎই খারাপ হয়ে যাওয়ায় এবং হাতের সামনে কোন ট্যাক্সিও না পাওয়ায়, সে রিকশায় চেপে এই সামান্য রাস্তাটুকু শরীরে অসহ্য ধকল ও যন্ত্রণা সহ্য করে এসেছে বাধ্য হয়েই।

আবার রূপকের সাথে অনেকে সদয় ব্যবহারও করছে। ভালোবাসছে। ভালো ভালো কথাও বলছে। তাদের মিষ্টি ব্যবহারও ভুলবার নয়।

পৃথিবীটা যখন বিচিত্র এবং বিচিত্র যখন তার প্রাণীজগৎ ও জড় জগতের রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ, বিচিত্র যখন তার শব্দসম্ভার ও ভাষা, সুতরাং মানুষের ব্যবহার অনুভূতি ইত্যাদি ও যে সমান হবেনা তাতে আর আশ্চর্য কি?

রূপক থাকে রঞ্জুদের সাথে বস্তিতেই। তার একমাত্র প্রৌঢ়া মা ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই।

রাত্রে সে লছমন বীতেশদের সাথে গান গেয়ে, হৈ-হুল্লোড় করে কিছুটা সময় কাটায়। তারপরে ঢলে পড়ে ঘুমের কোলে।

সারাদিনের খাটুনির পর ক্লান্তিতে ঘুমও আসে নিবিড় ভাবে। নিদ্রাদেবী যেন তার সমস্ত স্নেহ পরশ দিয়ে হাত বুলিয়ে দেয় রূপকের সারা অংগে।

এমনি করে একদিন বরানগরের টবিন রোড থেকে কিছুটা দূরে একটা সুন্দর বাড়ির পাশ দিয়ে ক্রিং ক্রিং করে রিকশা চালিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মেয়েলি কণ্ঠের ডাক শুনতে পেলো—

এই রিকশাওয়ালা দাঁড়াও।

রূপক দাঁড়ালো বাড়িটির সামনে। দেখলো বিরাট বাড়ি। উঁচু গেট। সামনে বাগান। বাগানে হরেক রকমের ফুল ফুটে আছে। থোকা থোকা লাল রঙ্গা রঙ্গন, সাদা সাদা টগর, চন্দ্রমল্লিকা, আকাশমনি, কামিনী, সাদা ও হাল্‌কা বেগুনি রঙের নয়নতারা, রক্তকরবী, মোসাণ্ডা ও বেলী ইত্যাদি আরও কত রকমের ফুল ফুটে আছে। ক্রিসানথিমাম, বেগনভিলিয়া ফুলের গাছও আছে অনেক। তার মাঝে বেশ বড় বড় সাইজের গোলাপগুলি যেন ফুটে আছে রাজরানীর ভঙ্গিমা নিয়ে। স্থানটা ফুলের গন্ধে ম ম করছে।

দুতলার বারান্দা হতে মেয়েটি ডাকছিলো। নাম মলি। বটল গ্রীন রঙের শাড়ী পরা মেয়েটি। ম্যাচকরা ব্লাউজ। পিঠে একরাশ মিহি কালো চুলের লম্বা বিনুণী দুলছে। ঠিকরে পড়ছে যৌবন। গায়ের রঙ বেশ ঝক্‌ঝকে ফর্সা। শুধু ফর্সা বললে ভুল হবে। দুধে আলতা গায়ের রঙ তো অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু দুধে আলতার সাথে দু' ফোঁটা বাসন্তী রঙ পাঞ্চ করলে কি হয় দেখেছেন কি? না দেখলে এই মেয়েটি অর্থাৎ মলিকে দেখুন। এক কথায় মলি যেন ফুটন্ত চাঁপার কলি।

মেয়েটির পুরো নাম মলি রায়। বয়স চব্বিশের মধ্যে। বেথুনে কলেজে লেখাপড়া করেছে।

তার বাবার নাম ধীরেন রায়। ধর্মে ব্রাহ্ম। বিরাট ব্যবসায়ী। লোহালক্কড়-ইস্পাত নিয়েই তার দিন রাত্রির কারবার। দেশে-বিদেশে নানা স্থানে ট্রাক লরি টেম্পো রেলগাড়ী জাহাজ ইত্যাদিতে মাল পাঠান তিনি। আবার আনেনও অনেক স্থান হতে অনেক কিছু।

একটু পরেই মেয়েটি তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো এবং বাগান পার হয়ে রিকশায় এসে উঠে বসলো।

বসেই বললো—বাঃ, বেশ ঝক্‌ঝকে নতুন রিকশাটিতো তোমার!

তারপর কিছুক্ষণ থ হয়ে তাকিয়ে রইল রিকশাওয়ালার সুন্দর স্বাস্থ্য ও ভদ্রোচিত চেহারার দিকে।

পরে চোখ ফিরিয়ে বললো—ওই যে মোড়ে চানাচুর ভাজার দোকানটা দেখা যাচ্ছে না, সেখানে নিয়ে চলো আমায়। চানাচুর কিনবো। দেখছো না আকাশটা কিরকম মেঘলা। গাছের পাতায় হাওয়ার দুলুনি। বৃষ্টি এলো বলে।

রূপক ভেবেই পেলো না, এই এতোটুকু পথের জন্য আবার রিকশা কেন।

কিন্তু রূপকতো জানেনা, অর্থবান লোকদের এরকম কত শত সখ থাকে।

মোড়ে গিয়ে রিকশায় বসেই রূপককে দিয়ে দু-টাকার ভালো চানাচুর কিনলো মেয়েটি।

এদিকে আকাশ আরও কালো হলো। তারপর আরও কালো। মেঘের ছোট ছোট দু-একটা গুরু গুরু আওয়াজও শোনা গেল।

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি নামলো রিম্‌ঝিম্‌ রিম্‌ঝিম্‌ শব্দ করে।

রূপক বললো—রিকশার ঢাকনাটা উঠিয়ে দিই দিদিমনি?

না।

ভিজে যাবেন যে!

ভিজতে আমার ভালো লাগে যে। তুমি বরং আস্তে আস্তে রিকশা চালাও যাতে আমি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ভিজতে পারি।

তারপর একটু থেমে আপন মনেই কাব্য করে বলে উঠল মলি—এতো ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টি ফুর্‌ফুরে হাওয়া, এ বৃষ্টি সহজেতে যায় না তো পাওয়া।

আরেকবার আশ্চর্য হলো রূপক বড়লোকের মেয়ের রকম সকম দেখে।

বাড়ির কাছে এসে রিকশায় বসেই ছোট একটি লাল ব্যাগ খুলে ভাড়া মিটিয়ে দিলো মেয়েটি। তার নরম তুলতুলে হাতের স্পর্শ পেল রূপক। তারপর প্রায় ছুটেই বাড়ির ভেতরে চলে গেলো।

রূপক রিকশা চালিয়ে চললো রাস্তার পাশ ঘেঁষে। অল্প কিছু দূর গিয়েই নজরে পড়লো রিকশার সিটের পাশে ছোট একটা কাগজ। কাগজটি দেখে সে বুঝলো লটারির টিকিট একটা। হয়তো ভাড়া দেবার সময় মেয়েটির ব্যাগ থেকে পড়ে থাকবে। সে রিকশা ঘুরিয়ে আবার সেই বাড়িটির সামনে এসে ডাকলো—

অ দিদিমনি, দিদিমনি।

কোন সাড়া নেই। আবার ডাকলো খুব জোরে—অ দিদিমনি, দিদিমনি।

এবার বারান্দায় এলো দিদিমনি। ভিজে চুল। গায়ের জামা-কাপড়ও ভিজে। ভেজা মেয়েদের দেখতে এত ভালো লাগে তা রূপক কখনো টের পায়নি। চোখাচোখি হতেই চোখ ফিরিয়ে নিলো রূপক। ভেজা কাপড়ের আড়াল থেকে তাঁর যৌবন-চিহ্ন উঁকি মারছে। স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

তখনো তরুণীর হাতে চানাচুরের ঠোঙা। মুখেও কিছু চানাচুর। বললে—কি হলো?

আপনার লটারির টিকিট।

দাঁড়াও যাচ্ছি। বলেই মেয়েটি দৌড়ে রিকশার নিকট এলো। টিকিটটি হাতে নিলো। রিকশাওয়ালার মুখের দিকে তাকালো একবার।

তুমি জানলে কি করে এটা লটারির টিকিট? এতো ইংরেজীতে লেখা?

রূপক হঠাৎ চমকে উঠলো। সামলে নিয়ে বললো—লোকেরা

লটারির টিকিট কেনে দেখিতো। দেখতেও এ রকমই টিকিটগুলো। তবে কি এটা লটারির টিকিট নয়?

লটারিরই টিকিট এবং আগামী সপ্তাহেই এর ড্রইং মানে খেলা, বুঝলে?

হ্যাঁ বুঝেছি। আচ্ছা চলি তাহলে দিদিমনি।

রূপক রিকশা ঘুরায়।

এই রিকশাওয়ালা শোন!

এটা তুমিই নাও। এটা তুমিই তো পেয়েছো। ফেরত না দিলে তো আমি পেতাম না।

না! আপনার টাকায় কেনা এটা। সুতরাং এটা আপনারই। আমি নেবো না দিদিমনি।

আমিতো দিয়েই দিচ্ছি তোমাকে। নাওনা। একটু মৃদু হেসে বললো মলি।

না। এবার বেশ একটু জোর দিয়েই বললো রূপক।

রিকশাওয়ালার আত্মপ্রত্যয় দেখে মলি চমকে যায়।

বৃষ্টি কিন্তু তখনও রিম্‌ঝিম্ ঝিম্‌ঝিম করে পড়েই চলছে।

আর এই যে কখনও রিমিরিমি ড্রিমিড্রিমি, কখনো রিম্‌ঝিম্ ঝিম্‌ঝিম্ শব্দে ঝরে পড়া বৃষ্টির বিচিত্র সুন্দর কনসর্ট শোনা যায় বৃষ্টি চলার সময়, ঐরকম বিচিত্র ছন্দের, বিচিত্র লয়ের, বিচিত্র মন ভোলানো প্রাণ জুড়ানো কনসার্ট কিন্তু আধুনিক কোন ডায়াসেই শুনতে পাওয়া যায় না। এখানেই মানুষ ও প্রকৃতির পার্থক্য।

মলি বোধহয় তন্ময় হয়ে সেই কনসার্টই শুনছিলো। তারপর হঠাৎই রূপকের কথার জের টেনে মলি বললে—তাহলে তুমি বলো, যদি এই টিকিটে টাকা পাই, তবে অর্দ্ধেক টাকা তুমি নেবে?

সে পেলে তখন দেখা যাবে দিদিমনি। বলেই রূপক রিকশা চালাতে শুরু করে। বড়লোকের মেয়ের এই সব খামখেয়ালিতে তার সময় নষ্ট করলে চলবে না। রূপক মনে মনে কিছুটা বিরক্তও হয়।

পেছন থেকে মলি চেঁচিয়ে বলে—তুমি থাকো কোথায়? নাম কি?

রুম্‌কোর বস্তিতে। শ্যামবাজারের দিকে। নাম রূপক।

বিরক্ত হলেও রূপক উত্তর না দিয়ে পারে না।

আমার নাম মলি। এটাই আমাদের বাড়ি। মলিও বলে বেশ জোরে চেঁচিয়ে।

তার পরেই হঠাৎ খিল্‌খিল্‌ করে একগাল হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বাড়ির ভিতর চলে যায় সে।

রূপক চলতে চলতে ভাবে কি রকম মেয়েরে বাবা। রিকশা-ওয়ালাকে অর্ধেক টাকা দেবে! তাও কি হয়? যতসব বড়লোকী ঢঙ্‌। আচ্ছা যদিই দেয় নেবো কি? না? হ্যাঁ নেবো। বড়লোক হয়ে যাবো যে একবারেই। না, নেবো না। এই ভালো। ধ্যুৎতরি—যতসব বাজে চিন্তা ভাবনা। চলতে চলতে আবার মনের ভেতর এরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বও শুরু হয় রূপকের।

ঘরে গিয়ে মলিও ভাবে কি রকম রিকশাওয়ালা! সেধে লটারির টিকিট দিতে চাইলে নেয় না। অর্দ্ধেক টাকা নিতে বললেও বলে—'দেখা যাবে।' চালাচ্ছ তো রিকশা—অতো দেমাক কিসের? তবে রিকশাওয়ালার চেহারাটি বেশ ভদ্র। আর কি আশ্চর্য উজ্জ্বল স্বাস্থ্য। হয়তো অভাবে পড়েই রিকশা চালাচ্ছে। মনে মনে এসবও ভাবছে মলি।

রিকশাওয়ালার কথাবার্ত্তায় মলির মনের ভেতরেও যে একটা ঝড়ের দোলা লাগছে তা মলি বেশ টের পায়।

তিন

গঙ্গার ধার। জায়গাটা নির্জন। ছোট বড় কয়েকটা বটগাছ আছে এ দিকটায়। আছে আমগাছ ও আরও কয়েক রকমের গাছ। আর আছে গঙ্গায় নৌকা ষ্টীমার জাহাজ লঞ্চ গাদাবোট ইত্যাদি।

ভোরের বেলা। সূর্য উঠছে পুব আকাশের গায়ে। কমলা

রঙের নরম স্নিগ্ধ সূর্য। তার আলোয় গঙ্গার জলও কমলার রঙের মতো টলমল করছে। গাছের উপর কিছু পাখীর কল কাকলি। মৃদু মৃদু হাওয়া বইছে।

এক সাধুর আশ্রম আছে একটা বড় সড় বটগাছের নীচে। লোকে বলে তান্ত্রিক সাধু। পরনে রক্তাম্বরা বসন নয়—শুভ্র বসন। কিন্তু কপালে লাল টকটকে একটা সিঁদুরের ফোঁটা আছেই। সে তান্ত্রিক সাধুই হোক আর অবধূত-সন্ন্যাসীই হোক, সৌম্য দর্শন কিন্তু সাধু। তার সারা দেহ ঘিরে রয়েছে অপূর্ব্ব এক জ্যোতিতে। ঘরের ভিতর হতে ধূপের সৌরভ ভেসে আসছে।

পাশেই গঙ্গায় একটি চলন্ত নৌকোর রেডিও হতে সুমিষ্ট কণ্ঠের গান ভেসে আসছে।

ও মন কেমনে হইবি পার ?
সামনে আছে অথৈ সাগর
কূল-কিনারা নাই যে তার ॥
সংসারটাই সঙের সাগর
কামিনী কাঞ্চনের নাগর
লোভের ঢেউ তার ডাগর ডোগর
কে করবে মন তোরে পার ॥
এই সাগরে ছয়টি রিপু বিকট রূপে আছে
তুই যদি মন সন্ন্যাসী হইস বাঁধা দেয় সে পাছে···
কাম বাসনা সামলে নিলে
পারের মাঝি হয়ত মিলে
সেই মাঝিই নৌকা বাইলে
পারের চিন্তা নাই তোর আর ॥

গানের বাণী, সুরের রেশ ও সুরের মূর্চ্ছনা যেন আছড়ে পড়ছে গঙ্গার ঢেউয়ে ঢেউয়ে।

সাধু একটু আগেই গঙ্গাস্নান করে ফিরেছে। খালি গা।

হঠাৎ রূপককে দেখলো আনমনে রিকশা চালিয়ে চলে যেতে। রূপক আজ খুব সকালেই বের হয়েছিলো। খুব ভোরের একটা বায়না ছিলো এদিকের।

সাধু তাকালো রূপকের দিকে। রূপকও তাকালো সাধুর দিকে। মুখটা কোন অতীতের চেনা চেনা মনে হলো সাধুর।

এদিকে আয় বেটা। বললো সাধু।

কেন সাধু বাবা, রূপক বললো।

দেখি হাতটা তোর।

কি হবে হাত দেখে, বলেও কিন্তু হাতটা বাড়িয়ে দেয় রূপক।

সাধু হাত দেখলো। ভালো করে চোখমুখ নিরীক্ষণ করলো। পরে বললো—

যা চলে যা।

কিছু বললেন না সাধু বাবা ?

না, চলে যা।

রূপক আবার চলতে লাগলো রিক্সা নিয়ে।

এভাবে কেটে গেলো দু'চার দিন। কেটে গেলো রিক্সা চালিয়ে, লছমন রঞ্জুদের সাথে গান গেয়ে, রাত্রি বেলা রুটি খেয়ে ও ঘুমিয়ে।

একদিন আবার পথ চলতে চলতে সাধুর আস্তানার কাছে আসতেই সাধু বলে উঠলো—

কিরে আবার এলি যে ? জানি তোকে আসতেই হবে। তোর কপালের রেখা যে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

শেষের কথাগুলি সাধু খুব আস্তে আস্তে বললো, রূপক শুনতে পেলো না।

যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে, বললো রূপক, ভাবলাম এখানটায় একটু জিরিয়ে নিই।

একটু দম নিয়ে রূপক আবার বললো—আচ্ছা সাধুবাবা, সেদিনতো কিছু বললেন না হাত দেখে।

তুই রাখতে পারবিনা বেটা।

কি রাখতে পারবো না? রূপকের গলায় ঔৎসুক্যের সুর।

বললামতো তুই পারবি না।

এখনওতো জানলামই না কি রাখতে পারবো না।

যদি তোকে কোন মাদুলি দিই—সাধু এবার চোখ বড় বড় করে বললো—রাখতে পারবি বাম হাতে ধারণ করে? বড়লোক হয়ে যাবি। যে সে মাদুলি নয়, অনেক পূবের মিসমি পাহাড়ের পাহাড়ী দ্রব্যগুণ সম্পন্ন মাদুলি। চাস্ ভাগ্য ফিরাতে? হবি বড়লোক? অনেক টাকার মালিক? কিন্তু কোন অবস্থাতেই যদি হারিয়ে যায় বা খুলে রাখিস তবে বিপদ হবে ভয়ানক।

ধারণ করে না রাখতে পারলে আমার জিনিষ আমাকে ফেরৎ দিবি, বুঝলি?

রূপক কিছুটা ভয় পেয়ে গেলো। ভাবলো তান্ত্রিক ফান্ত্রিক না কিরে বাবা। শেষে কিসের থেকে কি হয়ে যাবে। হয়তো মুশকিলে পড়ে যাবো।

তাই রূপক বললো—তবে থাক।

কিন্তু ভাগ্য ফেরাতে কে-ই আর না চায়। রূপকতো ভাগ্যটাকে ফেরানোর চেষ্টায়ই কত কিছু করে যাচ্ছে। কিন্তু ফিরছে কই।

তাই রূপক মনে মনে আবার ভাবে, নিই না—দেখিনা কি হয়! দেখতে দোষ কি। একজনতো বলেছে লটারির টাকা দেবে, এই সাধু বলছে মাদুলি দেবে, দেখা যাক না কি হয়। তারপর আবার সাধু বাবাকে বললো—আচ্ছা দিন।

সাধু বললো—কোন দিন খুলবি না তো?

—না।

—কোন অবস্থাতেই না?

—না।

সাধু তখন ঘর হতে একটা অনেক দিনের পুরনো মাদুলি এনে

কি সব তুক্‌তাক্‌ করে রূপকের গায়ে কমণ্ডুল হতে জল ছিটিয়ে দিয়ে বাম হাতে পরিয়ে দিলো।

তারপর সাধু বললো—যা, চলে যা। কিন্তু খুব সাবধানে রাখবি। যেদিন হারাবি বা সঙ্গে থাকবে না সেদিনই বা তখনই তোর বা তোর কোন প্রিয়জনের কোন না কোন বিপদ হবে কিন্তু। আর যদি এর ভার বহন করতে না পারিস তবে আমাকেই দিবি ফিরিয়ে। যা—এগিয়ে যা। মা—ভৈঃ!

খুব গম্ভীর করে শব্দ করলো সাধু—মা ভৈঃ!

সেই মা ভৈঃ শব্দের গম্ভীরতায় রূপক চম্‌কে উঠলো। মনে হলো যেন আকাশ বাতাস অন্তরীক্ষ একসাথে কেঁপে উঠলো। আবার সঙ্গে সঙ্গে অভয়ও পেলো। রূপকের মনে যেন অনেকটা বল এলো—এক অতিন্দ্রীয় বল, অতিন্দ্রীয় শক্তি।

তারপর ক্রিং ক্রিং শব্দ তুলে রিক্সা চালিয়ে রূপক চলে গেলো তার গন্তব্যস্থলের দিকে।

চার

কয়েকদিন পর। রূমকোর বস্তি। সকাল বেলা। রাস্তার কলে জল নিয়ে নর-নারী বাচ্চাকাচ্চার জটলা। ঝগড়া চেঁচামেচি। তারই মাঝে সবাইকে অবাক করে দিয়ে সুবেশা এক তরুণী ঢুকছে বস্তিতে। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। পরনে দামী সোনালী রঙের সিল্কের শাড়ী। গায়ের সোনালী রঙের সাথে শাড়ীর সোনালী রঙ মিশে গেছে। কানের দুলে হীরের ঝিক্‌মিক্‌। তাতে সূর্যের আলো। অপূর্ব।

তরুণীটি খুঁজছে রিকশাওয়ালা রূপককে।

বস্তির ছেলেমেয়ে বুড়া-বুড়ী তারাও সবাই অবাক। অতি উৎসাহী একটি ছেলে দৌড়ে গেলো রূপককে খবর দিতে। রূপক রিকশাওয়ালা হলেও বস্তির সবাই ওকে স্বতন্ত্রভাবে রেখেছে ও স্বতন্ত্রভাবে দেখেও।

রূপক সবে জামা কাপড় পরে রিকশা নিয়ে বের হবে বলে মনে

করছিল। খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি বের হয়ে দেখে সেই দিদিমনিটি।

রূপকের মনটা হঠাৎ ছ্যাৎ করে উঠলো। তবে কি লটারির টাকা·········সাধুর কথাও একবার ঝিলিক্ দিয়ে গেলো মনে, মুখে বললো—

আরে আপনি! কি ব্যাপার! কি সৌভাগ্য আমাদের এই বস্তির লোকগুলির। কিসে যে আপনাকে বসতে দিই! আচ্ছা বসুন এই মোড়াটায়।

একটা নাইলনের ফিতেয় বোনা বেতের মোড়া এগিয়ে দিলো রূপক মলির দিকে। মলি বসলো।

বসেই বললো—আমার সাথে একবার যেতে হবে তোমাকে। ব্যাঙ্কে। লটারির টাকাটা আমি পেয়েছি। সে অনেক অনেক টাকা। ফার্ষ্ট প্রাইজ। তোমাকে তার অর্ধেক নিতে হবে। আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম। মনে আছে তো?

এইটুকু বলে মলি একবার ভাল করে তাকিয়ে নিলো রূপকের চোখের দিকে। তারপর আবার বললো—

আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে এসেছি। প্রথমে তোমাকে নিয়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে তোমার নামে আর্দ্ধেক টাকার একটা একাউণ্ট খুলে দেবো। তারপর তুমি তোমার ইচ্ছামতো ব্যাঙ্ক হতে টাকা তুলে যে কোন কাজে খরচ করতে পারবে।

এবার মলি স্থির দৃষ্টিতে রূপকের বড় বড় চোখগুলির দিকে তাকালো। রূপকও একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলো।

তারপরই রূপক বললো—কিযে বলেন আপনি তার ঠিক নেই। এমন কথা তো অনেকেই দেয়।

অনেকের কথা দেওয়া আর মলি রায়ের কথা দেওয়া ঠিক এক কথা নয়। বুঝলে?

তাই তো মনে হচ্ছে মলি দিদিমনি।

রূপক এবার পাশের তক্তপোষটায় বসলো।

কিন্তু এটাও আবার বড়লোকের একটা বড় খেয়াল নয়তো, রিকশায় করে দু'টাকার চানাচুর কেনার মতো?

কথাটা বলেই রূপক গম্ভীর হয়ে যায়।

কথাটা মুখ ফস্‌কেই বের হয়ে গেছে তার। রূপক ভুলেই গেছিল যে সে একজন কলেজে পড়া শিক্ষিত যুবক হলেও এই মহিলার নিকট তার পরিচয় একজন রিকশাওয়ালা হিসাবেই।

তাই সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে বললে—কিছু মনে করবেন না, আমি কথাটা এমনিই বলেছি।

মলি রূপকের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই বললে—না-না কিছু মনে করছি না। তবে ভবিষ্যতে টাকা পেয়ে অর্থবান হয়ে এরূপ বললে কিন্তু কিছু মনে করবোই। বলে মলি একটু হাসলো।

টাকা তো আমি নেবো না দিদিমনি।

সেকি? কেন! মলি আশ্চর্য হয়ে বললে, তুমি কি বড় হতে চাওনা?

এদের ছেড়ে আমি বড় হতে চাইনা। রূপকের স্পষ্ট উত্তর।

রূপক যেন হঠাৎ বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে পৃথিবীটার প্রতি।

বেশতো আছি। সবাই মিলে মিশে কি সুন্দর জীবন। পারলে এদের পাশে থেকে এদের উপকার করবো। কি হবে বড়লোক হয়ে? বরং বড়লোক হলেই এই বস্তিবাসীদের ভুলে যাবো হয়তো।

তুমি বড়লোকদের খুব ঘৃণা কর নাকি? বড়লোকদের কি কোন প্রয়োজন নেই দেশে?

না, ঘৃণা করিনা, এবং তাদেরও প্রয়োজন আছে। আবার তাদের কাছে গরীবদেরও দরকার আছে খুব। গরীব না থাকলে বড়লোক তৈরীই হবে না। বড়লোক তৈরী করার মেশিনই হ'ল গরীব। এটাতো আপনি আমার চেয়েও ভাল বোঝেন নিশ্চয়ই।

এবার মলি কিছুটা বিরক্ত হয়েই বললো—আবার বড়লোক না থাকলেওঅনেক কিছুই হবে না। গরীবের পরিশ্রম ও বড়লোকের টাকা

ও বুদ্ধি থাকলেই কিছু হতে পারে। তুমি এসব বড় বড় কথা শিখলে কোথা থেকে? দেখে ও কথা বলে মনে হচ্ছে কিছুটা লেখাপড়াও জানো। ইউনিয়ন-টিউনিয়ন কর নাকি রিকশাওয়ালাদিগকে নিয়ে?

না। বললে রূপক।

তবে চলো। টাকাটা তোমাকে নিতেই হবে। এবার বেশ জোর দিয়েই বললো মলি। কারণ রিকশাওয়ালার নিকট হেরে যেতে সে রাজী নয়।

রূপক অনেক ভাবলো। হ্যাঁ বড়লোকেরও প্রয়োজন আছে দেশে। আবার বস্তির লোকগুলির ভালবাসা চিন্তা-ভাবনার কথাও ভাবলো। মনের ভেতর ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব হলো। তারপর একসময় ভাবলো, বড়লোক হলেতো সে নিজেও কোন না কোন ভাবে সাহায্য করতে পারবে লছমন রঞ্জুদের। অগত্যা টাকা নেওয়াই স্থির করলো।

এমন সময় রূপকের মা হেমাঙ্গিনী দেবী এলেন স্নান সেরে।

মলি দেখলো হেমাঙ্গিনী দেবীর বয়স পঞ্চান্ন কি ছাপ্পান্ন হবে। বিধবা ভদ্রমহিলা। ভিজে এলোচুল। গলায় সরু একগাছা সোনার চেন। গায়ের রঙ এককালে ফর্সা ছিলো। বর্তমানে পোড় খাওয়া। কিন্তু মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ আছে একটা।

রূপক পরিচয় করিয়ে দিলো, আমার মা।

তারপর মলির দিকে তাকাতেই·········

আমার নাম মলি রায়, একগাল হেসে বললে মলি। তারপর মলিই প্রথম বললে, নমস্কার।

রূপকের মা হাতজোড় করে মাথা নেড়ে নমস্কার গ্রহণ করলেন, তারপর বললেন—এতো সকালে আমার রূপকের কাছে এসেছো রিকশা ডাকতে? খুব দরকার বুঝি মা? তা গরীবের ঘরে একটু চা খেয়ে যাওনা। অবশ্য যদি কিছু মনে না করো।

না! না! মনে করার কি আছে এতে! তবে এখন তো খুব

ব্যস্ত আমি। অন্য দিন এসে খেয়ে যাবো'খন।

মা উনি রিকশা ডাকতে আসেন নি, এসেছেন আমাদের বড়লোক করে দিতে। এক্ষুনি আমি বেরুবো। ওর সঙ্গে সঙ্গে এক জায়গায় যাবো।

হেমাঙ্গিনী অবাক হ'ল। বিস্মিত কণ্ঠে বলেন, কী যে বলিস।

*   *   *

একটা ব্যাঙ্ক। দিন কয়েক আগেই মলি তার নিজের নামে লটারির সব টাকা এই ব্যাঙ্কে রেখে গেছে। আজ অর্ধেক টাকা তুলে রূপকের নামে একটা একাউন্ট খুলে দিতে চাইলো মলি তার পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মতো।

কিন্তু রূপক ব্যাঙ্কে এসে আবার বেঁকে বসলো। বললে, না আমি টাকা নেবো না দিদিমনি।

মলি আশ্চর্য হয়ে বলে, কেন নেবে না? বাড়ীতে তো রাজী হয়েছিলে।

কিন্তু এখন রাজী নই। এ আপনার অনুগ্রহের দান। অর্থবানের খেয়ালের দান। তাছাড়া এতো টাকা নিয়ে আমি কিই-বা করবো। আমার ভালো মাথাটা হয়তো এতোগুলি টাকা পেলে খারাপ হয়ে যাবে।

কেন ব্যবসা করবে টাকাটা নিয়ে। আর মাথা খারাপ হবার এতে কি আছে।

ব্যবসা আমার মাথায় সহজে ঢুকে না।

তুমি না বলেছিলে রঞ্জু বীতেশ ও বস্তিবাসীদের উপকার করবে। মলি রূপকের দুর্ব্বলস্থানে এবার টোকা দিলো।

হ্যাঁ তা তো বলেছিলামই। এখনও বলছি।

তবে টাকাটা নিয়ে ব্যবসা করলে তো এদেরও উপকার করতে পারো।

কি ভাবে? রূপকের কথায় এবার উৎসাহ ফুটে উঠলো।

ধরো যদি এ টাকা দিয়ে আমরা দুজনে একটা ছোট ফ্যাক্টরী করি, তবে তো লছমন বীতেশরাও এতে কাজ পেতে পারে এবং তুমিও ব্যবসার মাধ্যমেই রোজগার করে আরও বড় হতে পারো।

হ্যাঁ, এটা একটা কথার মতো কথা বলেছেন বটে। কিন্তু আমি যে ব্যবসার কিছুই বুঝি না। তবে আমি খেটে দিতে পারবো খাটতে আমি ভয় পাই না।

তাহলেই হবে। আর ব্যবসা? সে আমি বুঝবো। সে জন্য তোমার চিন্তা করতে হবে না। আমার বাবা ঠাকুরদারা তিন পুরুষের ব্যবসায়ী। আমি সে বংশেরই মেয়ে। আমার বাবাকে বলতে পার বিজিনেস ম্যাগনেট। আমি বাবার সাথে এ ব্যাপারে আলোচনাও করেছি। প্রথমটায় বাবা আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন আমি প্লানটা ভাল করে বুঝালাম, তখন তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

এবার মলির মাথায়ও ব্যবসার চিন্তাটা পাকা হয়ে ঢুকলো। মেয়েটির এটাই স্বভাব। যখন যেদিকে খেয়াল চাপবে সেদিকেই ঝুঁকবে। মা বাবার একমাত্র সন্তান, আদরের দুলালী। সেজন্যই মলির বাবাও মলির জেদের কাছে, পিতার সন্তান-স্নেহের কাছে পরাভূত হয়ে তার ব্যবসার প্লানটায় রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। বাবা এটাও ভেবেছিলেন, এই অতি দুরন্ত চঞ্চল মেয়েটার মন যদি ব্যবসার দিকে ঝুঁকে ব্যবসায় বাঁধা পড়ে তবে মন্দ কি?

দু'একবার মা বাবা বিয়ের চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু মলি বলেছিলো সে এখন বিয়ে টিয়ে করবে না, কিছুতেই না। যখন সময় হবে সে নিজেই বলবে। মা বাবা তারপর হতে আর কোন কথাই বলেন নি। তাছাড়াও একটাই মেয়ে, কাছ থেকে ছেড়ে দিতেও হয়তো তাদের কষ্ট হচ্ছিল।

এক সময় রূপক বললো—রঞ্জুদের গোবিন্দদের সাথে কিছু বস্তির লোককেও কিন্তু আমি কাজ দেবো মলি দেবী।

সে তো দেবেই।

তখন কিন্তু বাধা দেওয়া চলবে না।

না-না—বাধা দেবো কেন। সব কথাই না হয় দলিলে লেখা থাকবে। বলো, এবার তবে তুমি টাকা নিতে রাজী এবং ব্যবসাতেও রাজী?

হ্যাঁ রাজী। দুটোতেই রাজী। বললো রূপক।

রূপক রাজী হওয়ার সাথে সাথেই যেন মলির—কেন সে অবশ্য মলিও জানে না—মনে মনে রূপককে অনেকটা আপন মনে হলো।

তারপর ব্যাঙ্কের কাজকর্ম যথারীতি শেষ হবার পর মলি বললো—এবার চলো কিছু খাওয়া-দাওয়া করে গঙ্গার ধার দিয়ে খানিকটা হেঁটে বাড়ী চলে যাই। তুমি কাল সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ীতে যাবে। আমি বাবাকে বলে সবকিছু ঠিকঠাক করে রাখবো। সেখানে বসেই পার্টনারশিপের কাগজপত্র লিখা হবে। আর সই সাবুদও হবে। মনে রেখো এখন থেকে তুমি রিকশাওয়ালা নও। ব্যবসায়ী। হবু Business Magnet.

'Exactly So'—মলির ইংরেজী কথার Throwing ও Fluent-এর সাথে সাথে রূপকেরও ইংরেজী এসে গেলো এবং বলেই সে মলির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

মলি চম্‌কিয়ে বললে—কি, কি বললে! Ex-act-ly So; Pure accent দিয়ে উচ্চারণ, Fine Throwing, মলি তীক্ষ্ণভাবে রূপকের দিকে তাকালো।

তারপর আবার বললো—রূপক বাবু, আপনার আসল পরিচয়টা দেবেন আমাকে? আমার মাঝে মাঝেই সন্দেহ হতো। এবার দেখছি সন্দেহটা ঠিক। কি পরিচয় আপনার?

এবারে মলির সুরে সামান্য অভিমানের আভাষ পাওয়া যায়।

ধরা পড়ে গিয়ে রূপক বললো—গঙ্গার ধারে যাবেন বলছিলেন! চলুন! সেখানে বসে সব বলছি মলিদেবী।

গঙ্গার ধারে একটা গাছের নিচে বসে খুব সংক্ষেপে রূপক বলে চললো—

পূর্ব বাংলার মেঘনা নদীর ধারে ছিলো আমার গ্রাম। পাখী ডাকা, শিশির ধোয়া, সবুজ শ্যামলিমায় ভরা ও নদীর কলধ্বনিতে প্রাণ চঞ্চল ছিল সেই গ্রামখানি। চৈত্রের কাঠফাটা রোদে ফুটি-ফাটা মাঠ, বর্ষায় শাপলা ফুল আর কলমিলতার ধাম, গন্ধরাজ হিজল আর কদম ফুলের সুবাস, শরতের শিউলি ফুল ও সোনা ঝরানো আকাশ আর পৌষ-মাঘের গাঁদা অপরাজিতা ফুলের গন্ধ ও পাকা ধানের সোনালী রঙের বাহারে জুড়িয়ে যেতো আমার মন, খুশীতে ভরে উঠতো আমার প্রাণ। কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাছে 'শ্যামল গ্রাম' নামে ছিলো আমার মমতাময়ী বর্ধিষ্ণু গ্রামখানি।

সে গ্রামে সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে বাজতো কাসর ঘণ্টা ও শঙ্খ। জ্বলতো ঘৃতের প্রদীপ। হতো স্তোত্র পাঠ ও দেবারতি। গুগ্‌গুল ধূপের সৌরভে বাতাস হতো ভারী।

ছিলো স্বদেশ প্রেমিক বিপ্লবীদের গুপ্ত-আখড়া। শেখানো হতো ছোরা ও লাঠি খেলা, পিস্তল ও বন্দুক ছোড়া। ছোটবেলায় বাবার মুখে শুনেছিলাম এই গুপ্ত-আখড়ার কথা। শুধু ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও শিখতো এসব।

আর ছিল গ্রামের মাঝখানে বরদেশ্বরী-খণ্ড। জোড়া দুর্গাপূজা হতো সেখানে। পাঁঠা বলি হতো অনেক। আনন্দে উৎসবে কেটে যেতো পূজোর দিনগুলি।

আমাদের বাড়ি ছিল নদীর একেবারে ধারে।

আমি গ্রামের পড়া শেষ করে ঢাকা শহরে এসে কমার্স পড়তে কলেজে ভর্তি হই। বড় হয়ে ব্যবসা করারও ইচ্ছা ছিলো মনে মনে।

আমার বাবা ছিলেন রিটায়ার মিলিটারীর লোক। ছিলো মা আর ছোট্ট একটি ফুটফুটে বোন। ছোট্ট বোনটির কলকাকলি আর মেঘনা নদীর কলধ্বনি মিলে সারা বাড়ীটা সবসময় রমরম্

করতো। একদিন এক কালবৈশাখী রাতের প্রচণ্ড ঝড়ে উত্তাল মেঘনা, গ্রাস করলো আমাদের উত্তরের ঘরখানি। সে ঘরে শুয়ে ছিলো আমার বাবা ও আমার অতি আদরের ছোট্ট বোনটি।······ তার কয়েক মাস পরেই মাকে নিয়ে আমি কোলকাতায় চলে আসি। গ্রামের লোক অনেক বলেছিলো—অনেক বুঝিয়েছিলো গ্রামে থেকে মাষ্টারী করতে। কিন্তু আমি—আমি—থাকতে পরিনি। বাবা আর বোনের মৃত্যু, প্রায়ই দাঙ্গা, অবিশ্বাস আর অসম্মান, বাংলা দেশের যুদ্ধ, মুজিব জিয়া হত্যা, বিশৃঙ্খলা···, রূপক আর বলতে পারলো না।

রূপকের গলার স্বর শেষ দিকটায় বেশ ভারী হয়ে উঠলো, কিন্তু অচিরেই সামলিয়ে নিলো।

আর শুনছিলাম আমার এক কাকা ছিলেন। কিন্তু তিনি, আমার ছোট্ট বেলাতেই সাধু হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তাকে আর কোন দিন কেউ দেখেনি। এখন এক মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

এক নাগারে কথাগুলি বলে রূপক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর উভয়েই গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। গঙ্গা বয়ে চলেছে। ক্লান্তিহীন দীর্ঘ তার পথ চলা। ঠিক যেন রূপকের মতোই।

গোধূলী বেলা। গঙ্গার বুকে দু-একটা নৌকো ও ষ্টীমারে আলো জ্বলে উঠেছে। হাওয়াও বইছিলো ঝিরঝির করে গঙ্গার দিক হতে। ওপারে দেখা যাচ্ছিলো চিমনির কালো ধোঁয়া আকাশ ও গ্রাম সব মিলে মিশে একাকার। গঙ্গার উপর কয়েকটা গাঙশালিকও ঘোরা ফেরা করছে। দুটো সাঁঝের বলাকা সোজা উত্তর হতে দক্ষিণে চলছে কোন্ অজানার উদ্দেশ্যে কে জানে?

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে রূপক ও মলি কখন যে মনে মনে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলা তা কেহই টের পায়নি। টের পেলো এখন যখন নীরবতা ভঙ্গ করে মলিই প্রথম কথা বললো—

এবার নতুন করে জীবন আবার শুরু করুন রূপকবাবু। গলার

স্বরে বেশ কিছুটা অন্তরঙ্গ আকুলতা ফুটে উঠছে মলির। আর এই আকুলতাটুকু কিন্তু রূপকও টের পেলো।

আর এরই ছোঁয়ায় ঠিক এই মুহূর্তে একটা আনন্দ, একটা আবেগ, রূপকের বুকের ভিতরের হৃদ্‌পিণ্ড হতে সারা দেহে থির্‌থির্‌ করে কেঁপে কেঁপে বয়ে গেলো।

মুগ্ধ বিস্ময়ে রূপকও গভীর গাঢ় স্বরে বললো, তাই করবো মলি-দেবী। অদৃষ্টের হয়তো ইহাই ইচ্ছা আছে। চলুন ফেরা যাক এবার। সন্ধ্যা যে হয়ে এলো। ত্ব-একটা তারাও ফুটে উঠেছে আকাশে।

একটু নিরবতা। চারিদিক যেন চুপচাপ।

হঠাৎ মলি বললে—আচ্ছা, মানুষেরা মনের আকাশে কি এরূপ তারা ফুটাতে পারে না?

রূপক একবার মলির মুখেব দিকে দৃষ্টিপাত করে উত্তর দিলো—হয়তো ইচ্ছা করলে পারা যায়।

আপনি পারেন?

না।

তবে যে বললেন ইচ্ছা করলে পারা যায়?

সে মেয়েরা পারে। রূপক কৃত্রিম গম্ভীর।

কেন পুরুষেরা?

উঁহু! স্নো, সেন্ট, পাউডারের মতো আকাশ-চাঁদ-তারা-ফুল, এসব মেয়েদের একচেটিয়া ব্যাপার বুঝলেন। বলেই রূপক হো হো করে হেসে উঠে এতক্ষণের গুমোট আবহাওয়াটাকে হাল্‌কা করে দিলো।

তাই বুঝি—বলে মলিও হেসে উঠলো খিল্‌খিল্‌ করে। বেশ তো কথা বলতে পারেন আপনি। তারপর আবার বললে—সত্যিই সন্ধ্যে হয়ে গেলো। চলুন, ওঠা যাক। কাল সন্ধ্যায় যাবেন মনে থাকে যেনো।

হ্যাঁ যাবো। চলুন এবার।

শ্যামবাজারে এসে ওরা পরস্পরের নিকট বিদায় নিয়ে যার যার রাস্তায় চলা শুরু করলো।

পথে যেতে যেতে মলি ভাবলো—বেশ মিষ্টি কিন্তু ছেলেটি।

আর পথে যেতে যেতে রূপকও ভাবলো—বেশ মিষ্টি কিন্তু মেয়েটি।

পাঁচ

পরদিন সন্ধ্যা বেলায় রূপক এলো।

পার্টনারশিপের দলিল লেখা হয়ে গেলো।

জয়েন্ট ম্যানজিং ডাইরেক্টার হলো মলি ও রূপক নিজে। মাথার উপর উপদেষ্টা রইলেন স্বয়ং মলির বাবা ধীরেন বাবু অর্থাৎ ধীরেন্দ্র শঙ্কর রায়। বেশ কিছু টাকা ধীরেনবাবুও এতে ফাইনান্স করেছেন।

কোম্পানীর নাম হলো—M/S Modern Engineering and Metal Art Co.

কাদাপাড়া পার হয়ে উল্টোডাঙ্গার দিকে যেতে ডান দিকের অনেকটা ফাঁকা জমির উপর তৈরী হবে কারখানা। ধীরেন বাবু এবং ধীরেন বাবুর স্ত্রী অলকা দেবীও রূপককে দেখে খুব খুশী।

ধীরেনবাবু দেখতে যেমন উজ্জ্বল-শ্যামল ও ছিপ্ছিপে চেহারার—ছিপ্ ছিপে হলেও শার্প—এবং চকিত চোখ ও টিকল নাকের অধিকারী; অলকা দেবী তেমনি উজ্জ্বল-ফর্সা, দীর্ঘদেহী, তবে কিছুটা স্থূলাঙ্গী। তার নাকটা একটু মোটা ও চাপা বটে, তবে মুখখানা অনেকটা চৌকোনা ধরনের বড় বলেই নাকটা মানিয়ে গেছে। অলকা দেবীর মুখের সাথে মলির অনেকটা মিল আছে। তাঁর দু'কানে দুটো বড় বড় মুক্তোর টপ মাঝে মাঝে ঝিলিক্ দিচ্ছে। প্রশস্ত ললাটে টক্‌টকে লাল সিন্দুরের বিন্দু ও উপরিভাগে ঢেউ খেলানো চুলের

সিঁথিতে সিঁদুরের সরু রেখা। গলায় বেশ বড় একটা পাথর সেট লকেটওয়ালা সোনার চেন।

সবচেয়ে সুন্দর যা রূপক দেখলো তা হলো, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মুখেই একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তির হাসি যেন লেগেই আছে। বিশেষ করে অলকা দেবীর মুখে। চওড়া নীল পাড়ের সাদা মিহি জমির ধনেখালি শাড়িতে অলকা দেবীকে সত্যিই লক্ষ্মী প্রতিমার মতো মনে হচ্ছিলো রূপকের। বয়স উভয়েরই পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই।

ধীরেন বাবুও তীক্ষ্ণভাবে দেখলেন ছেলেটিকে অর্থাৎ রূপককে। দেখলেন ছেলেটি চৌকোশ এবং বুদ্ধিমান। তিনি মেয়ের বুদ্ধিকে মনে মনে তারিফ করলেন। তারিফ করলেন তার আধুনিক ফ্যাক্টরী করার পরিকল্পনাকে।

মলি তার বাবাকে ঠিকই বলেছিলো—এটা হলো পুরোনো পদ্ধতি ছেড়ে মডার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং, মডার্ন যন্ত্রপাতির যুগ। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ছাড়া এযুগে ব্যবসায় পাল্লা দেওয়া মুশকিল। তাই তোমার বাবার আমলের পুরনো পদ্ধতির যন্ত্রপাতির উৎপাদন ও সে সব ব্যবসা বর্তমানে মুখ বুজে মার খাচ্ছে। তুমি কম্পিটিশানে হেরে যাচ্ছো। প্যাট্রোকেমিকেল ইলেকটনিকস্ পলিথিন্যাল গুডস এক কথায় মডার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ও উপাদান ছাড়া, এযুগে সব অচল। ধীরেনবাবু তখন মেয়েকে বলেছিলেন, তুইতো আর্ট'স নিয়ে পড়েছিস, এসব জানলি কি করে? মেয়ে ঝট্‌পট্‌ উত্তর দিয়েছিলো—কেন, "যুগ রূপান্তর" পত্রিকা পড়ে। তাতে তো বাঙ্গালীর ব্যবসা মার খাচ্ছে কেন? বাঙ্গালী পিছিয়ে পড়ছে কেন ব্যবসা বাণিজ্যে? সাহসে না বুদ্ধির অভাবে, আর্থিক অসুবিধায় না অসার্থক স্পেকুলেশনে ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে বিস্তর, ধারাবাহিক লেখা বের হয়। ধীরেনবাবু, খুশী হয়ে বলেছিলেন, তাই বল। তিনি আরও বলেছিলেন, তুই তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্যের লেখাও পড়িস। উত্তরে মলি বলেছিলো, মাঝে মাঝে পড়ি আর কি।

ধীরেনবাবু আর ইতস্ততঃ না করে রূপক ও মলিকে ফ্যাক্টরী তৈরী করার ভার দিয়ে দিলেন। তার একমাত্র মেয়ে মলি যা চঞ্চল! এবার হয়তো মনটা একটু স্থির হবে। কাজের মধ্যে হয়তো ডুবে থাকবে। তাই তিনিও একমাত্র মেয়ের আধুনিক পরিকল্পনাকে রূপ দিতে রূপককে নিয়ে অতি সত্বরই কোমর বেধে কাজে লেগে যেতে মন স্থির করে ফেললেন।

রূপক মিলিটারী পিতার একমাত্র পুত্র সন্তান। ভদ্র, কর্মঠ। দেখতেও ভালো। মা আছেন শুধু সংসারে। ছোট বেলায় ব্যবসা বাণিজ্যের ইচ্ছাও ছিলো, তাই কলেজে কমার্স নিয়ে পড়াশুনাও করেছিলো। রূপকের এই পরিচয়ই ধীরেনবাবু পেয়েছিলেন মেয়ের মুখে। রূপকের রিকশাটানা জীবনের ইতিহাস মলি ইচ্ছে করেই উহ্য রেখেছিলো পিতার কাছে। প্রয়োজন হলে সময়মত বলা যাবে এটাই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলো সে।

ফ্যাক্টরীর লাগোয়া জমিতে প্রথমেই ছোট একটা কোয়ার্টার তৈরী করে এসে উঠলো রূপক ও তার মা হেমাঙ্গিনী দেবী। প্রয়োজন বোধে ধীরেনবাবু ও মলির জন্য ছোট একটি স্বয়ংসম্পুর্ণ বারান্দা-ওয়ালা ঘরও নির্দিষ্ট রইলো।

ফ্যাক্টরী তৈরীর কাজ চলছে পুরোদমে। লোহালক্কর-সিমেন্ট-বালি-ইট-দড়ি-বাঁশ-বীম ষ্টোনচীপস্ কত রকম জিনিষপত্র আসছে হরদম্। রাজমিস্ত্রী, জোগালি, কনট্রাকটার, কুলির হাঁকাহাঁকি চেঁচামেচিতে জায়গাটি সরগরম।

ধীরেনবাবু এসে প্রায়ই তদারকী করছেন। আর মলি রূপক-তো খাটছে সব সময়ই। মলি আর রূপকের যেন একটা ঝিম্ধরানো নেশা লেগে গেছে এই কারখানা তৈরী করার জন্য।

কাজ শেষ করে মলি বেশীর ভাগ সময়ই বরানগরের নিজের বাড়িতে চলে যায়। মাঝে মাঝে খুবই বেশী কাজের চাপ থাকলে এখানেও থেকে যায়। বাড়ী হতে বেয়ারা খাবার দিয়ে যায়।

কোন কোন দিন আবার হেমাঙ্গিনী দেবীও নিজের হাতে রান্না করে মলিকে খাওয়ায় রূপকের সাথে। মলি এটা ওটা চেয়েও খায় আবদার করে। হেমাঙ্গিনী দেবীর হাতের ছোট ছোট মরলা মাছের টক ঝোল মলির খুবই প্রিয়।

ইতিমধ্যে ধীরেনবাবু ও ধীরেনবাবুর স্ত্রী অলকা দেবীর সাথেও একদিন আলাপ পরিচয় করে এসেছিলেন হেমাঙ্গিনীদেবী রূপককে নিয়ে। হয়েছিলো ব্যবসার কথাবার্তা, হয়েছিলো নানা রকম গল্প-গুজব। আর হয়েছিলো রূপক ও মলির কথা।

অলকা দেবী হেমাঙ্গিনী দেবীকে বলেছিলেন—মলি বুঝি খাওয়া দাওয়া নিয়ে আপনাকে খুব উৎপাত করে ?

না-না ! ওতো কিছুই খেতে চায় না। আমি তো জোর করে রূপকের সাথে ওকে টিফিন খাইয়ে দিই।

বলেন কি ! অত লক্ষ্মী হয়ে গেছে আমাদের মলি। বাবার মতো আবার ব্যবসা ও কারখানার নেশায় না পেলেই হয়। তবে তুটিতে কিন্তু মিলেছে বেশ। কি বলেন দিদি ?

তা যা বলেছেন। কারখানা নিয়েই তো মেতে আছে তুজনে। আর হৈ হুল্লোড়ও করছে কম নয়।

এরূপ কথাবার্তায় সেদিন রাত হয়ে গিয়েছিলো অনেক। সেদিন রাতে রূপক ও তার মাকে না খাইয়ে ছাড়েননি অলকা দেবী।

রূপক, মলি ও ধীরেনবাবু বিশেষ করে অভিজ্ঞ ধীরেনবাবুর বুদ্ধি ও অক্লান্ত পরিশ্রমে আশাতীত কম সময়ের মধ্যেই ফ্যাক্টরী মোটা-মুটি তৈরী হয়ে চালু হয়ে গেলো। আরও কাজ হচ্ছে।

লছমন, গোবিন্দ, রঞ্জু ও বীতেশ সবাই কাজ পেয়ে গেছে এখানে। আরো কিছু বস্তির লোকও কাজ পেয়েছে রূপকের কথায়। কাজ পেয়েছে বস্তির কিছু মেয়েও।

দিনের পর দিন লোহা ও ইস্পাতের আধুনিক বড় বড় বিভিন্ন বিভিন্ন যন্ত্রপাতির উৎপাদন, ছোট বড় স্প্রীং, ছোট ছোট আধুনিক

যন্ত্রপাতি, ঢালাই যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উৎপাদন বেড়েই চলেছে। রপ্তানী হচ্ছে লরি করে, জাহাজে ও রেলে করে বিভিন্ন দেশেবিদেশে, গ্রামে গঞ্জে।

রঞ্জু সহকারী সুপার ভাইজার হয়েছে। ঘুরে ঘুরে সব কাজকর্ম দেখে। নিজেদেরই কারখানা মনে করে কাজ করে সবাই। ফাঁকি দেয় না কেউ।

বয়লারের কাছাকাছি কাজ করে গোবিন্দ ও লছমন। কঠোর পরিশ্রম করে হাসিমুখে।

বীতেশ করে ফাইল পত্র দেয়াথোয়ার অফিসিয়াল কাজ।

তারা সবাই অসীম শ্রদ্ধা করে রূপককে। রূপকের জন্যই তাদের সকলের একটা স্থায়ী হিল্লে হয়ে গেলো এই কারখানায়।

ফ্যাক্টরী চলাকালীন নানান ধরনের আওয়াজে ওদের প্রথম প্রথম অসুবিধে হতো। এখন অবশ্য সবই সয়ে গেছে।

কোন দিন হয়তো রঞ্জু ঘুরতে ঘুরতে কোন ছেলেকে বলে—কিরে! কত পেটি মাল উঠলো? পাঁচটার মধ্যে সব কয়টা মাল শেষ করতে পারবি তো?

হ্যাঁ রঞ্জুদা, ঠিক তুলে দেবো মাল—বলে ছেলেটি। ছেলেটির নাম টিনা।

রঞ্জু বললো—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

আবার একটু এগিয়ে গিয়ে—কিরে ঝুম্‌কি পম্পি গোলাপী আয়েষা তোদের কাজ শেষ হলো?

এই শেষ হয়ে এলো বলে রঞ্জুদা—সবার হয়ে আয়েষাই উত্তর দেয় রঞ্জুর দিকে চেয়ে।

প্রায়ই কাজের ফাঁকে ফাঁকে গোলাপী ও গোবিন্দর অনেকটা ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়। হাসিঠাট্টাও চলে কিছুটা। তাদের ফাঁকা মন বোধ হয় আর ফাঁকা থাকতে চায় না। ভরাট হয়ে যেতে চায়। আর ভরাট হয়ে গেলে জমাটও হয়ে যায় তাড়াতাড়ি।

ওদের ফষ্টিনষ্টি দেখে একদিন বীতেশ বলছিলো লছমনকে—ওরা ডুবে ডুবে প্রেম করছে রে, আবার প্রেমে প্রেমে ডুবেও যাচ্ছে। ডুবে ডুবে জল খেতে খেতে আবার ভেসেও উঠছে। ভেসেই আবার হেঁচকি মেরে ফের ডুবে যাচ্ছে। বুঝলি।

হ্যাঁ বুঝলাম। ওদের বোধহয় খুব তাড়াতাড়িই হারিয়ে ফেলতে হবে আমাদের। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলো লছমন।

এভাবে এদের দিন চলে যাচ্ছে। চল্‌ছে ফ্যাক্টরীও। শ্রীবৃদ্ধিও হচ্ছে কারখানার দিনের পর দিন। খুশী ধীরেনবাবু। খুশী রূপক. মলি সবাই ?

একদিন তো ধীরেনবাবু খুশীর আবেগে রূপক ও মলিকে বলেই ফেললেন—সব সময়ই তোমরা কাজের নেশায় ডুবে থাক কেন কারখানায় ? মাঝে মাঝে একটু এদিক ওদিক বেড়িয়ে এসো। তাতে নতুন করে কাজেরও উৎসাহ বাড়বে এবং মনও প্রফুল্ল থাকবে।

এই কথাটায়ই মনে হয় রূপক ও মলির ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশাটা ধীরেনবাবুর খুব পছন্দ। ধীরেনবাবুর মনের আনাচে কানাচে হয়তো এর মধ্যেই অন্য কোন বাসনাও উঁকিঝুঁকি দিয়ে যাচ্ছে।

ছয়

তারপর হতেই রূপক ও মলি মাঝে মাঝে বেড়াতে যায় গাড়ী করে। হেঁটেও যায় কোন কোন দিন। যায় বোটানিক্যাল গার্ডেন, ইডেন গার্ডেন, কালীঘাট, আউটট্রাম ঘাট, চিড়িয়াখানায়, ভিক্টোরিয়ায়। যায় টেংরার পাগলা বাবার স্থানে। সেকেণ্ড লেনের পীর বাবার মাজারে। যায় বেলুড় দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ। আদ্যাপীঠের ভাত ও খিচুড়ি প্রসাদ ওদের খুব ভালো লাগে। আর ভাল লাগে দক্ষিণেশ্বরে ঘটা করে পুজো দিতে।

আর যায় লেকে। বিশেষ করে বেলেঘাটার লেকে। যার নাম

সুভাষ সরোবর। বেলেঘাটার লেকের মসৃন নীরবতা নাকি মলি ও রূপক উভয়েরই ভাল লাগে। আবার এখানে হু হু করে পুবাল হাওয়াও বয়। গাছের পাতায় কাঁপন লাগে থিরি থিরি। তাদের মনেও কি লাগে সে হাওয়ার ঢেউ? কেঁপে কেঁপে উঠে কি মনো-বীণার তারগুলি। রিন্‌ঝিন্ করে বেজে কি সুরের হিল্লোল উঠে তাতে?

একদিন রূপক বলেছিল—লেকের জলের মত তরল আপনার হাসি। শুনে মলি প্রথমটায় মিষ্টি করে, পরে আরও একটু বেশী মিষ্টি করে হেসেছিলো।

লেকের পাশের সুরেন সরকার রোডের ধারের সুইমিং পুলে ডাইভ দেওয়া, সাঁতার কাটা এবং তারই পাশে খেলার মাঠে ফুটবল খেলাও তারা দেখে মাঝে মাঝে। দেখে আনন্দও পায় প্রচুর।

সাধু বাবার কাছেও যায় রূপক ও মলি। সাধুজীকে সবই বলেছে রূপক।

মলি একাও যায় কোন কোন দিন বেড়াতে সাধুর কাছে বা এখানে সেখানে।

এতো কাজের মধ্যেও মলি আর রূপক দার্জিলিং ও পুরী ঘুরে এসেছিল একবার। বড়লোকের মেয়ে মলি দার্জিলিং ও পুরী ইত্যাদি জায়গায় এর আগেও গিয়েছিলো মা বাবার সাথে। কিন্তু রূপকের সাথে ব্যবসার পার্টনার হওয়ার পরের এই যাওয়ার চার্ম ছিলো সম্পূর্ণ অন্য রকমের।

দার্জিলিং ট্রাঙ্ককল করে ধীরেনবাবুই সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তার এক বন্ধুর হোটেলে। বন্ধুকে বিশেষ করে বলেও দিয়োছিলেন যাতে ওদের কোন অসুবিধা না হয়।

তাছাড়া দার্জিলিং-এ বিজিনেসম্যানদের বিশেষ একটা সেমিনারে তিনি ওদেরকে বড় বড় বিজিনেস ম্যাগনেটদের সাথে চাক্ষুস পরিচয় করিয়ে দিতেও চেয়েছিলেন। মালিদের বলেও দিয়েছিলেন পর

দিন ঠিক সময় মতই তিনি হোটেলে হাজির হবেন এবং সেখান হতে ডাইরেক্ট সেমিনারে! অদ্য বিশেষ একটা জরুরী কাজ থাকার জন্যই তার পক্ষে একসাথে যাওয়া সম্ভব হলো না। সেমিনার শেষ করেই তিনি সোজা কোলকাতায় চলে আসবেন। ওরা ইচ্ছে করলে দু-চার দিন সেখানে থাকতেও পারে।

মলি ও রূপক রওনা হলো দার্জিলিং। দার্জিলিং যাওয়ার পথে সোনাদা পার হয়েই রূপক বলেছিল—একটা গান গাননা মলি দেবী।

কি গান?

আপনার মন যে গান চায়। মলি গেয়েছিলো তার প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীতটি,

আমার এ প্রেম নয় যে ভীরু,
নয় তো হীনবল—
শুধু কি এ ব্যাকুল হয়ে
ফেলবে অশ্রুজল।
মন্দমধুর সুখে শোওয়া
প্রেমকে কেন ঘুমে ডোবায়
তোমার সাথে জাগতে যে চায়
আনন্দে পাগল।

গাড়ী চলছিল দ্রুতগতিতে। রূপকই চালাচ্ছিল হাল্‌কা সবুজ রঙের ফিয়েট গাড়ীটা। এই কয় মাসেই পাঞ্জাবী ড্রাইভারের নিকট হতে শেখা রূপকের ফার্স্ট গীয়ারটা টপ্ গীয়ারে উঠেছিল। মলিই তাকে শিখিয়েছিলো পাকা ড্রাইভিং।

হিলকার্ট রোড ধরে দার্জিলিং-এ ওঠার ঘুরানো রাস্তার দুধারে সবুজের সমারোহ, ওক, পাইন, ফার দেবদারু ইত্যাদি গাছের সারি, নানা ধরনের রঙ বেরঙের পাহাড়ী ফুল, বিশেষ করে বেশ বড় সাইজের পাহাড়ী ধুতরা ফুল—বেশীর ভাগই সাদা রঙের, অল্প সল্প বেগুনী রঙেরও আছে—টয় ট্রেন—দ—লুপ্—ঝরনা দূরের আরও

উঁচু পাহাড়, পাহাড়ের নিচের গভীর খাদ, পাহাড়ী ছেলেমেয়ে যুবক-যুবতীদের অনাবিল সুন্দর মুখ ইত্যাদি দৃশ্য দেখতে দেখতে তারা ও তাদের গাড়ী ছুটে চলেছিলো আগে—আরও আগে—আরও আরও আগে দার্জিলিং-এর দিকে।

গতির আনন্দে পার হয়ে গেল সোনাদা—কার্সিয়াং ও ৭০০৪ ফুট উপরে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু রেলস্টেশন 'ঘুম'—'বাতাসী লুপ'।

মাঝে মাঝে মলির সুরেলা কণ্ঠের সাথে রূপকও গেয়ে উঠেছিলো আনন্দের উৎসাহে গানের দু'একটা কলি।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ের ছোট আকারের সাদা স্থল পদ্মের মতো ক্যামেলিয়া ফুলগুলিও ওদের মনকে আকৃষ্ট করতো।

এক জায়গায় দেখলো বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত পাহাড়ি ছেলে-মেয়েদের ছন্দোময় নাচ।

সন্ধ্যার পরেই দার্জিলিং পেঁৗছে তারা পূর্ব নির্ধারিত হোটেলে পরপর দুটি ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলো।

এর পরদিন বিকেলেই ওরা মলির বাবার সাথে এ্যাটেন করেছিলো বিজিনেস সেমিনারে। সেমিনার চলছিলো পুরো চার ঘণ্টা।

তার পরদিন সকালে তারা দেখেছিলো দার্জিলিং-এর টাইগার হিলের সূর্যোদয়, তার রঙের খেলা ও কাঞ্চনজঙ্ঘায় তার প্রতিফলন।

মলি বলছিলো—সত্যিই নয়নমনোহর ও বিস্ময়কর সৌন্দর্যে ভরা এই সূর্যোদয়! সারা বিশ্বের রঙের সমস্ত সৌন্দর্য ও কলা-কৌশল যেন উপচে পড়ছে টাইগার হিলের সূর্যোদয়ের সময়ে। ঠিক উদয়ের মুহূর্তে সূর্য যেন তার সাত রঙের সমন্বয় নিয়ে কখনো এগুচ্ছে পিছুচ্ছে, কখনো উপর হতে নিচ বা নিচ হতে উপরে রঙের ঢেউ খেলাচ্ছে। কখনো বা দ্রুত চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। এ এক পরম আশ্চর্য। আপনি কি বলেন রূপকবাবু?

আবেশে বিভোর রূপক চোখ বুজে উত্তর দিয়েছিলো—আপনার বর্ণনা সুন্দর, দেখাও সার্থক।

টাইগার হিলের কাঁচে ঢাকা ঘরে তারা গরম গরম কফিও খেয়েছিলো একটি ছোট্ট নেপালী ছেলের নিকট হতে কিনে। ছেলেটিকে দুজনে দু'টাকা বকশিসও দিয়েছিলো। ভারী খুশী ছেলেটি। ফেরার পথে দেখেছিলো হিমালয়ান মাউন্টেনারিং—জলাপাহাড়—চিড়িয়াখানা—লেবং হ্যালিপ্যাড্ ইত্যাদি স্থানগুলি।

তাদের ভালো লেগেছিলো দামী হোটেলের তিনতলায় বসে কাচের জানালার ভিতর দিয়ে দেখা রাতের দার্জিলিংকে।

জানালার পাশে বসে মলি বললো রূপককে—দেখছেন পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে রাতের দার্জিলিংয়ের আলোর মালা যেন নীল আকাশের গায়ে হাজার হাজার তারার মতোই ফুটে আছে। কি অপূর্ব তাদের সৌন্দর্য!

রূপক বললো—এক সাথে অত উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে এতো আলোর ফুল বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যাবে না।

খুব সম্ভব তাই! শৈলরাণী তো আর লোকে শুধু শুধু বলেনি। উত্তর দিলো মলি।

তাদের আর ভালো লেগেছিলো ম্যাল। তারা কেনাকাটা করেছিলো নেপালী ও টিবেটান মেয়েদের কাছ থেকে কিছু উলের জিনিষপত্র।

ম্যালের লাগোয়া হোটেলে নেপালী সুন্দরীদের মন ভুলানো নাচও দেখেছিল একদিন।

ম্যালের উপরে মহাকালের মন্দিরে পূজোও দিয়েছিলো তারা।

শৈলরাণীর শিখরে হিমালয়ের ক্রোড়ে প্রকৃতির নিবিড় অঞ্চল-ছায়ে এই মন্দির অপরূপ স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য্যের মধ্যে এরূপ পবিত্রতায় বিরাজমান যে সে স্থানে মানব আপন ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা ভুলে অসীম অনন্তসত্তার সান্নিধ্য লাভ করে। পুণ্য লোভাতুর সরল হৃদয়

ভক্তের স্বতঃনিঃসৃত পুণ্য সৌরভে মন স্বতঃতই হয়ে উঠে দেবমুখীন।

এই দেবমুখীন মন নিয়েই মন্দিরে ঘণ্টা বাজিয়ে ফলমূল ফুলে পূজো দিয়েছিলো রূপক ও মলি।

দুহাতে অঞ্জলিভরে নিয়েছিলো পূজোর প্রসাদী ফল ও ফুল।

স্বল্প সময়ের হলেও দার্জিলিং সফরটা তাদের স্মৃতিপটে ছিলো অনেকদিন।

*　　*　　*　　*

আর পুরীতে মলিদের নিজস্ব বাড়িতেই উঠেছিলো তারা। অলকা দেবীর চিঠি পেয়ে দারোয়ান আগে হতেই সবকিছু ঠিকঠাক করে রেখেছিলো। অলকা দেবীরও আসার কথা ছিলো, কিন্তু কাজের ঝামেলা বেড়ে যাওয়ায় তিনি আর আসতে পারেন নি। এখানে অবশ্য সেমিনার টেমিনার কিছু ছিলো না। নিছক বেড়াতেই আসা তাদের। নিজেদেরই বাড়ি যখন, মাঝে মাঝে কেউ না এসে থাকলেও তো হয় না।

পুরীর সমুদ্র সৈকত, সমুদ্রের গম্ভীর গর্জন, অনন্ত নীল আকাশের নিচে ফেনিল নীলাম্বুরাশি, সামুদ্রিক পাখী, শঙ্খচিল, চিক্‌চিক্‌ বালির উপর ঝিক্‌মিক্‌ ঝিনুক, রূপক ও মলির মনকে কোন এক অতিন্দ্রীয় অনুভূতির আনন্দলোকে পোঁছে দিয়েছিলো।

সমুদ্র সৈকতের মতো রূপক ও মলিকে আর যা আকৃষ্ট করেছিলো তা হলো জগন্নাথের মন্দির ও কোণারকের ব্ল্যাক প্যাগোডার আশ্চর্য্য শিল্প সম্ভার। তারা বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো বহু অতীতের শিল্পীদের শিল্পসৌষ্ঠব দেখে, সৌন্দর্যের মসৃণতা দেখে, নিপুণতা দেখে।

একদিন। সমুদ্রতীর। চাঁদনী রাত। দুজনেই পাশাপাশি বসে। অশান্ত হাওয়ায় উড়ে উড়ে যাচ্ছিলো মলির ডিপ্‌ বেগুনি রঙের উপর হলুদ সবুজের চেককাটা শাড়ীর আঁচল। উড়ছিলো কপালের দুপাশের শ্যাম্পু করা চুল। দু'হাত দিয়ে মাঝে মাঝে মলি সরিয়ে দিচ্ছিলো অশান্ত চুলগুলিকে।

পরিবেশ বোধ হয় মনকে মুড়ি করে তোলে।

একবার মলি রূপকের দিকে তাকিয়ে বলেছিলো—দেখছেনতো, কি দুষ্টু হাওয়া, কিছুতেই বাগে রাখা যাচ্ছে না চুলগুলিকে।

ক্লিপ দিয়ে আটকিয়ে রাখুন না—বলেছিলো রূপক।

দিন তো মাঝের দুটো ক্লিপ খুলে, বলে মাথাটায় যেখানটায় ক্লিপ দুটো ছিল সে জায়গাটা হাত দিয়ে দেখালো মলি।

আমি খুলে দেবো? রূপক আশ্চর্য হয়। মনে মনে খুশীও হয়।

হ্যাঁ! আপনি নাতো কে? এখানে আর কেউ আছে নাকি? বলেই মলি একটু কাছে সরে এলো এবং ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসলো।

অগত্যা রূপকও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে এসে ক্লিপ দুটো খুলে ফেললো।

এবার আটকিয়ে দিন। ভাল করে আটকিয়ে দিবেন কিন্তু যাতে আবার একটু পরেই খুলে পড়ে না যায়।

রূপক দ্বিরুক্তি না করে ক্লিপ দুটো ভাল করে এবং ইচ্ছা করেই একটু বেশী সময় নিয়ে মলির চুলে এঁটে দিলো। মলিও দু'হাত দিয়ে রূপকের হাত ধরে তাকে সাহায্য করলো।

দেখছেন কি সুন্দর আকাশ, ফুট্‌ফুটে জোছনা, ফেনিল ঢেউ; এ সময় মনটা যেন কেমন কেমন উদাস হয়ে যায়। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে রূপকের কানে কানে বললো—অনেক কিছু পেতে চায় মন।

রূপকও মৃদুকণ্ঠে বললো—কি কি পেতে চায়?

তাতো জানি না। বলেই মলি তার মাথাটা আলতো ভাবে রাখলো রূপকের কাঁধের উপর। রূপকও ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগাল মলির নিবিড় ঘন কেশরাশীতে।

রূপকের কাঁধে মাথাটা রেখেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন অনেক দূর হতে ভেসে আসা কণ্ঠে বললো মলি—কিছু বুঝনা রূপক? শুনতে পাওনা বুকের কোন না বলা কথা?

মলির সামনের পৃথিবী এখন অনেক বড়, অনেক উদার। ঠিক এই মুহূর্তে মলি তার সবকিছু যে কোন লোককে দান করে দিতে পারে।

কিন্তু মলির মুখে হঠাৎ নিজের নামটা প্রথম শুনতে পেয়ে রূপক চমকে উঠলো, তারপরই সামলিয়ে নিয়ে শান্ত গাঢ়স্বরে বললো—শুনতে পাচ্ছি মলি। কিন্তু তোমরা যে খুব বড়লোক। তাই ভয় হয় সমুদ্রতীরের আজকের এই স্মৃতিটুকু পাছে হারিয়ে যায়।

ছোট হয়ে গেছে রূপকের পৃথিবী। এই ছোট্টটুকুই সে এখন আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় প্রাণপণে।

এখন তো তুমিও বড়লোক হয়ে গেছো। বললে মলি।

না। আর তা ছাড়া আমি সমুদ্রের নোনা জল, আর তুমি নদীর মিষ্টি পানীয়।

কে বললে তোমায়! নদীর মিষ্টি পানীয় আর সমুদ্রের নোনা জল কখন যে মোহনায় মিলে মিশে এক হয়ে গেছে তাকি তুমি বোঝ-না রূপক? আবেশে নয়ন মেলে বললো মলি।

তাই যেন হয় মলি, তোমার কথাই যেন সত্যি হয়।

রূপকের পৃথিবী আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। আরও বড় আরও উদার।

আকাশে তখন লক্ষ তারার মেলা। তার নিচে ভাসছে সাদা সাদা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। তারও নিচে সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের আনন্দ-নৃত্য।

মলি ও রূপকের হৃদয়েও তখন ঝিক্‌মিক্‌ ঝিকিমিকি লক্ষ তারার মেলা, সাদা, কালো, হলদে, সবুজ সোনালী, গোলাপী কতো রঙের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ও ঢেউয়ের উজ্জ্বল, উচ্ছল আনন্দ-নৃত্য।

এ ভাবেই পুরীর সমুদ্র তীরেও বিনিময় হয়েছিলো মলি ও রূপকের কিছু বলা ও নাবলা কথার। স্পর্শ করে গিয়েছিলো কিছু কিছু স্বপ্নের—না ছুঁয়েও ছুঁয়েছিলো কিছু কিছু আবেগ।

*   *   *   *   *

আর একবার বোম্বের “বাজাজ ও ঝাঝারিয়া কোম্পানীর” সাথে ধীরেনবাবুর ব্যবস্থামত ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে তুই নং সিটিং সেরে প্রায় তুটোয় বের হয়ে রূপকই প্রথম বললো—আচ্ছা আজকাল তো শুনেছি গোয়াটা নাকি খুব উঠেছে, না দেখলে নাকি টুরিষ্টদের জীবনই বৃথা—চল না খুব শর্টে এক পাক ঘুরে আসি মলি। বোম্বেতে ও তার আশে পাশে যা দেখার—শিবাজী মন্দির, জুহুবীচ হুজরীমল, মেরিন ড্রাইভ, কমলা নেহেরু পার্ক, বিহারী লেক, পাওয়াই লেক, স্টেডিয়াম, এলিফ্যান্টা গুহা ইত্যাদি—সবই তো শেষ। অজন্তা ইলোবাও। সিনেমাও দেখা হলো একটি। ফ্যাক্টরীর কাজও কমপ্লিট। ভিক্টোরিয়া টারমিনাস হতেই তো এয়ারকণ্ডিসন টুরিষ্ট বাসগুলি ছাড়ে। আর সাথে সাথে গোয়ার আয়রণ ওর দিয়ে কোন ছোট ব্যবসা গোয়াতে ষ্টার্ট করা যায় কিনা তাও সরেজমিনে দেখা হয়ে যাবে। তোমরা বাবা কিন্তু গোয়ার এই বিশেষ ধরনের আয়রন ওর-এর কথা একবার বলেছিলেন। তাছাড়া সেখানে মিঃ বনশলের নিকট হতে আমরা সব রকমের পরামর্শ ও সাহায্য পাবো একথাও তিনি বলেছিলেন।

মলি এক বাক্যেই গলা ছেড়ে হুর্‌রে বলে প্রস্তাবটাকে লুফে নিলো ক্রিকেট খেলায় শিল্পে ব্যাটের মুখ হতে ক্যাচ লুফার মতো। ঘুরতে পারলেতো তার মজাই লাগে।

কাঁটায় কাঁটায় চারটে পাঁচ-এ এয়ারকণ্ডিশন টুরিষ্ট বাসটা বিভিন্ন যাত্রীতে ঠাসা হয়ে ছাড়লো।

সন্ধ্যা নাগাদ পাহাড়ের চূড়ায় সূর্য অস্ত যেতে দেখলো রূপক ও মলি। কি সুন্দর তুলনাহীন সে দৃশ্য। সূর্য তার সাতরঙা রশ্মিগুলি পাহাড়ের গায়ে আকাশের বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে অস্ত যাচ্ছে। তারপর মুঠো মুঠো সোনা ছড়াতে ছড়াতে সে ধীরে ধীরে পাহাড়ের ওপারে ডুব দিলো। নেমে এলো আবছা আঁধার। বাসের ভিতরে হালকা নীল লাইট জ্বলে উঠলো একসময়।

শোঁ শোঁ করে বাস চললো ষাট মাইল সত্তর মাইল বেগে।

রাত প্রায় সাড়ে দশটায় "হোটেল হিল সাইড ভিউতে" এসে বাস থামলো। বাস যাত্রীরা প্রায় সবাই হুড়মুড় করে নেমে যে যার খাবারের সন্ধানে ছুটলো। একটা গুজরাটি ফ্যামিলির ছুটো মেয়ে ছুটলো সবচেয়ে বেশী, পড়ি কি মরি করে। মেয়ে ছুটো যেন তারুণ্যের একটা ঝিলিক।

মলি আর রূপক গরম গরম সুগন্ধি সরুচালের ভাত আর গরম মুরগীর ঝোল পেট ঠেসে খেয়ে নিলো!

তারপর বাসে উঠে আবার আরাম করে বসলো।

গুজরাটি মেয়ে ছুটো মলি ও রূপকের দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন বলাবলি করলো নিজেদের মধ্যে। একটা আবার ঠোঁট উল্টালো কেন বোঝা গেলনা।

সবযাত্রী উঠে গেলে তীব্র হেডলাইট ছুটির আলোর শূল দিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে চিরে বাস আবার চললো উর্ধশ্বাসে গোয়ার অভিমুখে। এবার যেন গতিবেগ আরও বেশী। বাসের টেপ-রেকর্ডারে গান বেজে উঠলো, 'আগায়া আগায়া'। গতির আনন্দে সবাই ঝিমুচ্ছে বাসের।

রূপক আর মলিও ঝিমুতে ঝিমুতে এক সময় তন্দ্রাভিভূত হয়ে গেলো।

সেই গুজরাটি ফ্যামিলির মেয়ে ছুটোর বক্‌ বক্‌, হাসাহাসি—মেয়ে ছুটো অবশ্য দেখতে সুন্দরী—তাদের তন্দ্রা মাঝে মাঝে ছুটিয়েও দিচ্ছিলো।

এই তন্দ্রার মাঝেও তারা অনুভব করলো আঁকাবাঁকা ঘুরানো পথে বাস কখনো পাহাড়ের উত্তুঙ্গ চূড়ায় উঠছে আবার নামছে। কতো পাহাড়, কতো রাস্তা, কতো গ্রাম বনানী যে পেরুলো তার সংখ্যা নেই।

এভাবেই রাত ভোর হলো।

তারপর সকাল সাতটায় ওরা পৌঁছে গেলো গোয়ার রাজধানী পানাজীতে।

পানাজী। সকাল। হোটেল ইম্পিরিয়াল-এর তিনতলা। আট নম্বর আর নয় নম্বর ঘর। কর্ণানের ঘর। আছে রূপক ও মলি।

আছে নানা দেশের নানা জাতের বোর্ডার। তাদের খানাপিনা আলাদা, পোষাক আলাদা, ভাষা আলাদা, তবু সবাই টুরিষ্ট। সবাই দেশ দেখার নেশায়, জানার নেশায়, অস্থির-আনন্দে ডগমগ।

পাশে কুলু কুলু প্রবাহিতা মাণ্ডবী নদী। ওপারে ছোট ছোট পাহাড় সবুজ বনানীতে ঢাকা। মাণ্ডবী নদীর উপর সুন্দর সেতু। নদীর বুকে জাহাজ, নৌকা ও লঞ্চ। উপরে স্থির নীলাকাশ। নীল আকাশের নীচে নদীর উপরে এক ঝাঁক সাদা পাখী কখনো ইংরেজী 'ভি' টাইপ, কখনো 'ডাবল ভি' কখনও বা 'ইউ' হয়ে ঘুরছে মনের খুশীতে। একটা এরোপ্লেন শব্দ করে পানাজী বিমান বন্দর হতে উঠে ক্রমে দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেলে।

রাজধানী পানাজী। ঝকঝকে শহর। ছোট্ট। অল্প লোক। টুরিষ্টরাই সংখ্যায় বেশী। বাঙ্গালীরা আরও বেশী।

বেড়াতে বেরোল মলি ও রূপক।

বিকেল বেলা। আগুয়াদা ফোর্ট। ইহা পর্তুগীজদের একদা বিখ্যাত দুর্গ ছিল। বর্তমানে সেন্ট্রাল জেল।

গোয়ানিজ গাইডকে বলতে শোনা গেলো—এখানেই আপনাদের বাঙালী ত্রিদিব চৌধুরী বন্দী ছিলেন আরো অনেকের সাথে। আর এই যে উর্ধে-উত্থিত-হস্ত বলিষ্ঠ যুবক দাঁড়িয়ে আছে গেটের পাশে, এটা গোয়ার স্বাধীনতার শহীদদের স্মৃতি ষ্টাচু।

রূপক আর মলি বসেছিলো একটা বড় গাছের নিচে মস্ত বড় একটা পাথরের চাঁইয়ের উপর। নিচে—অন্ততঃ ত্রিশ চল্লিশ ফুট নিচে—আরব সাগরের জল ঝল্‌মল্‌ করছে সূর্যের সোনালী আলো পড়ে। দূরে দেখা যাচ্ছে মেরীমার বীচ্‌।

মলি সাগরের সৌন্দর্য দেখছিলো বসে বসে।

গাইডের কথায় রূপকের মনটা চলে গেলো দূর অতীতের দিকে।

সে মলির দিকে তাকিয়ে বললো, মলি চোখ বুজে দেখো আর কান পেতে শোনো—গাইড আবার বলতে শুরু করলো, গোয়ানীজদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, পর্তুগীজদের অত্যাচার, জে, এন, চৌধুরীর নেতৃত্বে ভারতীয় বীর জওয়ানদের ভারী বুটের আওয়াজ, পর্তুগালের গর্ব এলবুকার্ক জাহাজকে আরব সাগরের বুকে ডুবিয়ে দেওয়া, পর্তুগীজদের আত্মসমর্পণ এবং অবশেষে স্বাধীন গোয়ার জন্ম। শত শত বীর কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবি শহীদদের রক্তে জন্ম নিয়েছে এই স্বাধীন গোয়া। সেই শহীদের মধ্যে পুরুষদের মতো নারীদের সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিলো না।

মলি বিহ্বল হয়ে সব শুনছিলো আর ছায়াছবির পর্দার মতো যেন সে দৃশ্যগুলি তার চোখের সামনেই ভাসছিলো।

তারপরও বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে তারা সেদিনের মতো হোটেলে ফিরে এসেছিলো।

এর পরদিন প্রায় সারাদিনটাই ওদের কাটলো আয়রন-ওর এর সন্ধানে, তা দেখে দেখে এবং গুণাগুণ ও উৎকর্ষতার পরীক্ষা নিরীক্ষায়, আর আলাপ আলোচনায়। মিঃ বনশল অবশ্য সব ব্যাপারেই তাদের সাহায্য করেছিলেন। এদের বেশীর ভাগ সময়ই কেটেছিলো গোয়ার খনি এলাকা কারচোরেম ও কেনটিতে।

তার পরদিন প্রথমেই মেরীমার সী বীচ দেখতে গেলো দুজনে। মলির পরনে হাল্‌কা গোলাপী রঙের জর্জেটের শাড়ী, নিচে ফুল তোলা কালো ফলস পাড় লাগানো ও ম্যাচ করা ব্লাউজ।

অপূর্ব দেখাচ্ছিলো মলিকে।

আলতো পায়ে বীচের বালুর উপর দিয়ে যখন মলি হাঁটছিলো রূপক তন্ময় হয়ে দেখছিলো দূর হতে তার চলার ছন্দ। কী যে ভালো লাগছিলো।

একরাশ এলোচুল তার পিঠে মাঝে মাঝে হাওয়ায় আছড়িয়ে পড়ছিলো।

আরব সাগরেব নীল জল হতে উঠে আসা গোলাপ-পরী নয়তো? রূপকের মনে দু'একবার এ প্রশ্নও জেগেছে।

ওকে আরও ভাল লাগছিলো তখন, যখন সে গোঁড়ালির উপর সামান্য কাপড়ের পাড়টা তুলে সমুদ্রের বেলাভূমির অল্প জলের উপর দিয়ে ছলাৎ ছলাৎ করে আলতা পরা পাগুলি ফেলে ফেলে হাঁটছিলো। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আবার হাঁটছে। রূপক পুরীতেও তাকে সাগর সৈকতে এরূপ হাঁটতে দেখেছে। এটা তার বরাবরের অভ্যাস যেন। মলির ফর্সা ধপধপে পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রূপক তন্ময় হয়ে যেতো। নারীর পাও এত সুন্দর। জল থেকে কাপড় বাঁচাতে মলি যত না তুলতো, তত ভালো লাগতো রূপকেব। মনে হতো আর একটু তুলুক না, আর একটু! আহা, কী সুন্দব পা!

মসৃণ কালো ও সাদা পাথরে তৈরী দয়ানন্দ বান্দোদকারের সমাধি গৃহটিও মেরীমার বীচের দর্শনীয় স্থান।

অনেক ট্যুরিষ্টদের ভীড়ে স্থানটি ঘিরে আছে। সেই গুজরাটী মেয়ে দুটি একটি অল্পবয়সী বাঙালী বধূর হাতের শাঁখা দুটো দেখিয়ে বললে—এগুলি কি এবং কেন? বধূটি বললে—বিবাহিত মেয়েদের চিহ্ন এবং মুচকি হেসে বললে, বিয়ে হলে তোমরাও পরবে। মেয়ে দুটিতো শুনে হেসে কুটিকুটি—বিশেষ করে বিয়ের কথা শুনে। হঠাৎ মলিকে সামনে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মলির হাতের দিকেও একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিলো।

সেই প্রথম বাসে এক রাতের দেখা হতেই বোঝা গেল মলির সম্বন্ধে ওদের কৌতুহল আছে একটা চাপা।

মলি ও রূপক দুজনেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে দেখে এসেছে সমাধি গৃহটি।

তারপর তারা গেলো কেলাংগুয়েট বীচে। এই বীচকে কুইন অফ দি গোয়ান বীচ বলা হয়। আরব সাগরের বুকে সুন্দর বীচ।

ঝাউ গাছের ফাঁকে ফাঁকে নর-নারীর অবসর যাপন, সাগরে স্নান, যুবক যুবতীর ছোটাছুটি বেশ ছুটির আমেজ এনে দিচ্ছিলো জায়গাটায়।

ইয়ং হিপিগুলি সুইমিং কষ্টিউম পরেই চানের পর বালির উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। মেয়ে হিপি পুরুষ হিপি দুইই আছে। ওদের লজ্জা সরমের বালাইটা একটু কম কিনা।

রূপক একজোড়া হিপিকে দেখিয়ে মলির গায়ে টোকা দিয়ে বললে—কি গো সুইমিং কষ্টিউম পরে ওই রকম হবে নাকি? তাহলে চলো কষ্টিউম ভাড়া করে চানটা সেরেই বালিতে ওদের মতো আমরা দুজনেই গড়াগড়ি যাই।

মলি আরক্তিম হয়ে বললে—যাও। ভারী অসভ্য তো। আমাদের কি ওরকম শোভা পায়।

পাওয়ালেই শোভা পায়—রূপক বললে ফিস্ ফিস্ করে।

এতোই যখন সখ একটা ইয়ং হিপিনীকে নিয়ে তুমিই যাওনা চান করতে। আমার মনে হয় তোমার আবেদনে ওরা সাড়া না দিয়ে পারবে না। দেখতে তো লাভ্‌লি আছো ঠিকই—বলেই মলি চোখ তেরছা করে এক ঝলক্ রূপকের দিকে তাকিয়ে নিলো।

রূপক বললো—উহুঁ! তুমি হিপিনী সাজলে আমি হিপি হতে রাজী, নতুবা নয়।

তারপর মলির কানের কাছে মুখ এনে আবার ফিস্ ফিস্ করে বললো—মনের মত হিপিনী না হলে কি হিপি সেজে সুখ পাওয়া যায়?

চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে—আমি তোমার মনের মতো না কি?

তার চোখে মুখে আরব সাগরের এক ঝলক খুশীর ফেনা যেন উছলে পড়ছে।

রূপক উত্তর দিলো না এ কথার।

কি কথা বলছো না কেন? রূপকের গায়ে কনুই দিয়ে মৃদু একটি খোঁচা দিলো মলি।

কি কথা বলবো? উদাস গলায় বললে রূপক। রূপক টের পেয়েছে—মলি এখন দোল্‌ছে। দোল্‌ছে আবেশে, দোল্‌ছে সপ্নিল নীলে, দোল্‌ছে রঙীন মায়াজালে।

মলির মনের এই সুন্দর আবেশটুকুন রূপক এতো তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে দিতে চায় না।

মলি আবার বললো—কি হলো?

রূপক বললো—কি? এবারও উদাস রূপক।

এই যে আমি তোমার মনের মতো কিনা? বলো না। অনুনয়ের শেষ পর্যায়ে মলি।

কিছুটা মনের মতো—এতক্ষণে প্রায় স্বাভাবিকভাবে বললে রূপক।

সঙ্গে সঙ্গে মলি ফোঁস করে উঠলো—মাত্র কিছুটা! শুধু তাই না, মলির ঠোঁটে অভিমানও ঝরে পড়লো।

রূপক দেখলো আর দেরী করা ঠিক না। মেয়েদের মন। ওদের এককথায়ই বুঝে ফেলবে পৃথিবীর কোন শা……।

ওরা এই ফুল,—এই ফল; এই আগুন—এই জল, এই ভীষনা—এই সুনয়না; এই দীপ্ত—এই তৃপ্ত। ওরা যে কখন কি আর কখন কি না, ওরা যে কি চায়, আর কি চায় না, তা, বোধ হয় বাবা আশুতোষও হলফ করে বলতে পারেন না। ফ্রয়েড সাহেব কি আর সাধে বলেছিলেন—ত্রিশ বৎসর একটানা মেয়েদের মন নিয়ে নাড়া-চাড়া করেও তিনি এই সুন্দরীদের মনের কোণের এক ফোঁটাও হদিস পান নি।

তাই রূপক আর দেরী না করে সহজ গলায় এবং বেশ জোর

দিয়েই বলে ফেললো—আরে না না, সবটাই মনের মতো—বুঝলে রানী।

রানী! সে আবার কে! আমি তো মলি। আশ্চর্য হয়ে বললো মলি।

আবার বিভ্রাট। মেয়েদের মনে খট্‌কা লেগেছে।

এই শুনছো! এই রানীটি কে?

বলবো না। রূপক অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কথাটি বললো।

এই বলো না! মলি ফের খোঁচা দিলো। এবার কনুই দিয়ে নয়। আঙ্গুলে।

কি? রূপক মুখ ফেরালো।

ঠিক করে বলো না—রানী কে? মলির চোখে কিছুটা সন্দেহের আভাষ। এই আভাষটুকু রূপকের চোখ এড়ায় না।

তাই রূপক তাড়াতাড়ি বললো—রানী আবার কে! তুমিই রানী। কখনো কখনো তো তুমিই আমার হিন্দি ফিল্মের ডায়ালগের মতো "দিল্‌কা রানী"—"মেরে পিয়ারী"—এসব হয়ে যাও কিনা, তাই বললাম।

ও এই কথা। সন্দেহের কালো মেঘটা কেটে গেলো মলির মন হতে।

আর একবার মলির মনটা আরব সাগরের খুশীর ফেনায় ঝলমল্ করে উঠলো।

এরপর আনজুনা বীচ। এ বীচটা অন্যান্য বীচ হতে একটু স্বতন্ত্র। সমুদ্র এখানে প্রায় দশ হতে পঞ্চাশ ফুট নিচে হবে। বালি নেই। লৌহ মিশ্রিত পাথরের পাহাড়ী-বীচ। খয়েরী রঙের। এগুলি এক ধরনের আয়রন-ওর। কোন কোন জায়গায় এই পাথরগুলি সমুদ্রের বুকে অনেকটা চলে গেছে নিচু হয়ে। সমুদ্রের জল বায়ু তাড়িত হয়ে আছড়িয়ে পড়ছে পাথরের বুকে আর অমনি চতুর্দ্দিকে ছিট্‌কিয়ে পড়ছে জলের রূপোলি কণা সহস্র ফণা হয়ে।

মলি সে দৃশ্য দেখে তন্ময় হয়ে বলে উঠলো—পুরী দীঘা জুনপুট ইত্যাদি সীবীচ হতে এর জৌলুসই আলাদা।

তুমি কি বলো রূপক ?

মাথা নেড়ে সায় দিলো রূপকও। মুখে বললো-এক পাথর হতে অন্য পাথরে যেতে কিন্তু সাবধান মলি। দেখছো না এদিকটা কি ভীষন এবরো থেবরো আর সামান্য পিচ্ছিলও।

মুখের কথা রূপকের শেষও হয়নি। মলি হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলো। রূপক তার পড়ন্ত দেহটা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে মলিকে টাল সামলিয়ে দিলো।

রূপক বললো—আর একটু হলেই একটা অঘটন ঘটাতে।

আমি কি ইচ্ছা করে ঘটাতে যাচ্ছিলাম নাকি ?

—কেউ কি ইচ্ছা করে ঘটায় ?

—দেখছোনা সামনের চাঁইটার ফোকরে কি যেন নড়ছে। অনেকটা মাছের মতো। তাইতো ওটাকে দেখতে তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলাম।

রূপক দেখলো, তারপর বললে—সত্যিই তো, তবে ওটা মাছ নয়। সামুদ্রিক জীব। রূপক ও মলি আরও দেখলো এদিককার চাঁই-গুলির ফাঁক ফোকরে আরও অনেক রকমের ছোট ছোট জ্যান্ত সামুদ্রিক জীব নড়াচড়া করছে।

মলি বললে—চলো আর একটু এগিয়ে আরব সাগরের জলে হাত ছুঁইয়ে নিই। দেখছোনা ওরা দুজন কতটা এগিয়ে গেছে।

সামনে অনেকটা দূরে একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে দেখা গেলো। হাওয়ার তোড়ে মেয়েটার বিনুনী সাপের মতো পিঠে দুলছে।

রূপক বললে—না। আর এক কদমওনা। বড্ড যে সাহস দেখছি।

কেন কি হবে ?

পাথরে আছাড় খেয়ে দেখছোনা জল কি ভীষণ ভাবে চারিদিকে ছিট্‌ছে।

ছিট্‌ছেতো কি হয়েছে?

শাড়ী ভিজে যাবে যে।

যাক শাড়ী ভিজে। ভিজতে তো আমার ভালোই লাগে। মনে নেই প্রথম দিনের তোমার রিকশায় চড়ে সেই চানাচুর কেনার কথা? বলে মলি একটা ভেংচি কাটলো।

রূপকও চোখ টিপে বললো—গায়ে শাড়ী সাপ্টে যাবে যে।

সাপ্টে গেলে তো ভালোই। দেখতে তোমার ভালোই লাগবে। সারা দেহের ছন্দই তখন তোমার চোখে লেপ্টে যাবে।

আমি কিন্তু জাপ্টে ধরবোনা। এবারের মতো পড়ে গেলেও না।

সে তুমি ধরবেই। তা আমি বিলক্ষন জানি। মলি ঠোঁট চেপে হাসলো এবং হেসেই অগ্রসর হতে যাচ্ছিলো।

রূপক তাড়াতাড়ি হাত ধরে বাধা দিলো। অগত্যা মলিকে ফিরতেই হলো।

সেখান থেকে ফিরে তারা গেলো চোপরা ফোর্টের ধ্বংশস্তূপের পাশে 'বাগাটোর'-এ। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। অনেক লোক সূর্যাস্ত দেখার জন্য এই বীচের পাড়ে এখানে সেখানে বসে গেছে।

মলি আর রূপকও বসে গেলো একটা নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে অনেকটা দূরে, যে জায়গাটায় দুটো নারকেল গাছ একসাথে মিশে বেশ কিছু উঁচুতে উঠে আকাশ দেখছে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে আরব সাগরের বুকে।

মলি দেখছে, রূপক দেখছে—সূর্য ডুবছে। উদার অনন্ত নীল আকাশের নিচে, সাগরের বুকে, ঢেউয়ের মাঝে, সূর্য ডুবছে। প্রথম কমলা রঙের নিরুত্তাপ গোল সূর্য জল ছুঁই ছুঁই করছে। জল ছুঁইলো সূর্য। সূর্যের রঙ পালটে হয়ে গেলো যেনো হালকা লাল। সূর্য ডুবছে। এবার সোনালী সূর্য। জলের বুকে এক ড্রাম তরল সোনা

যেনো কে ঢেলে দিলো। চিক্‌মিক্‌ ঝিক্‌মিক্‌ করছে যেনো জলটা। জল নড়ছে টলছে ত্বলছে, তরল সোনাগুলিও নড়ছে টলছে ত্বলছে। সূর্য অর্ধেক ডুবে গেলো। এবার সূর্যকে একটা সোনালী রঙের খোলা লেডিস ছাতি (যা দূর থেকে অর্ধ-চন্দ্রাকার দেখা যায় সাগরের বুকে) বলে মনে হচ্ছে। তারপর মনে হলো সোনালী ছাতিটা জলে ভাসছে ঢেউয়ের তালেতালে, ভাসছে আর ছোট হচ্ছে। তারপর মনে হলো কড়াভাজা লুচি যেমন খয়েরি মিশ্রিত সোনালী রঙের হয়, সেরূপ খয়েরী সোনালী আভার আধখানা লুচি যেনো খাড়া ভাবে জলে ডুবছে। আধখানা ডুবন্ত বড় লুচিরূপ-সূর্যটা ক্রমে ছোট হচ্ছে। আরো ছোট, আরো আরো ছোট। তারপর শেষ সাত রঙের ঝিকিমিকি জলের বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সেই কড়া ভাজালুচি-সূর্য ডুবে গেলো টুক্‌করে। ডুবে গেলেও কিন্তু সূর্যের সাত রঙের খেলা অনেকক্ষণ চোখের সামনে ধাঁধা হয়ে যেনো ভাসতে থাকলো।

মলি ও রূপক আনন্দের উল্লাসে উভয়ে উভয়কে জড়িয়ে ধরে স্থানকাল পাত্র ভুলে চেঁচিয়ে উঠলো—অপূর্ব অপূর্ব ! ওয়ান্‌ডারফুল !

পরদিন ওরা ডোনা পাওলায় প্রথম গেলো। ডোনা পাওলায় বিখ্যাত কৃষক রমণীর প্রেমের কথা গাইডের মুখে শুনে ওরা অবিভূত হলো।

ডোনা পাওলা আরব সাগরের বুকে একটা খয়েরী রঙের রকের উপর অবস্থিত মনোরম স্থান। উপকূলের সাথে সেতু দিয়ে সংযুক্ত। এখানকার প্রথম বিদেশী মিঃ রবার্ট ম্যাক্স ও মিসেস ম্যাক্স এর শ্বেতপাথরের মূর্তি দেখলো ওরা ডোনা পাওলার উপরিভাগে। ওখানেই কাফেটারিয়াতে পান করলো রূপক ও মলি দুটো কোল্ড ড্রিঙ্ক।

সেখান থেকে বোন জেসাস গির্জ্জা ও মঙ্গোয়াসী মন্দির দেখে তারা গেলো মহালসা মন্দিরে।

তারা দেখলো মহালসা মন্দিরের প্রবেশ পথের বিখ্যাত

বাতিদানটি। এটির উচ্চতা হবে প্রায় বিশ ফুট। বাতির থাকও আছে অনেক। কয়েক মন পিতলের তৈরী এটা। প্রতিটি থাকে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়ে প্রদীপ বসানো আছে এবং থাকের পরিধি নিচ হতে বড় হয়ে ক্রমে উপরদিকে উঠে গিয়ে ছোট হয়ে মিলিয়ে গেছে। অনেকটা দেবদারু গাছের মতো দেখতে।

রূপক ও মলি আশ্চর্য হলো দেখে বাতিদানটি।

এর আগে এমনটি আর ওরা দেখেনি।

তারপরে গেলো শান্তা দুর্গায়।

মলি দীর্ঘদেহী শান্ত সৌম্যশ্রী-পুরোহিত মহাশয়কে বলে জেনে নিলো—চার হাত নিয়ে দুর্গা এখানে শান্ত অর্থাৎ পীস্ হয়ে আছেন।

মলি বাহির হতে কিনে নেওয়া ফুল দিলো মন্দিরের বিগ্রহের দিকে দু'হাত ভরে ছড়িয়ে। আর রূপক দিলো প্রণামীর টাকা।

এক সময় রূপক বললো, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো, এখানকার দেবতার মন্দিরগুলিতে দেবতাদের কত খোলামেলা আলোকিত পরিবেশে রাখা হয়েছে। এমন কিন্তু রাখা হয় না, পুরী কোনারক বা কাশী-গয়াতে। মলি তার কথায় বিস্মিত কণ্ঠে জবাব দেয়, তাই তো! তা শুনে হেসে ওঠে রূপক, হাসতে হাসতে বলে, দেখলে তো, আমি বললাম বলেই এই সুন্দর ট্যুরটা হলো। নতুবা তো কোম্পানীর কাজ সেরে বম্বে হতেই আমরা কোলকাতায় ফিরে যেতাম। এবং আধুনিক গোয়ার—যেখানে বড় কোন ফ্যাক্টরী নেই বললেই চলে—ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধাটাও খতিয়ে দেখা হতোনা।

তা অবশ্য ঠিক। এই ক্রেডিটটা তুমি অনায়াসেই নিতে পারো, মলি বললে।

এবার তবে আমায় পুরস্কার দাও।

কি পুরস্কার?

তোমার যা খুশি, বলে রূপক একটু অর্থপূর্ণ ভাবে মুচকি হাসলো।

মলি রূপককে দেখলো, মলিও হাসলো এবং বললো—বেশ হোটেলে গিয়ে দেবো।

পুরস্কারটা বেশ দামী হবে তো? না অল্প দামের হবে? বললে রূপক মলির দিকে একটু বাঁকা চোখে তাকিয়ে।

মলি বললে—পুরস্কার পুরস্কারই, তা বেশী দামেরই হোক আর কম দামেরই হোক। তারপর হেসে বললে—এই! কথার লাইনটা পালটাবে না,-আবার রিক্সাটানার লাইনে ভিড়িয়ে দেবো?

না দেবী, তুলে যখন এনেছো সেটা আর করো না। এই আমি কর্ড লাইন পাল্‌টিয়ে মিটার গেজে লাইন শুরু করলাম। নাকি একেবারে ব্রড গেজে চলে যাবো?

তুমিতো সব সময়ই বড়টাই চাও। ছোট কিছুতে কি আর তোমার মন ভরে? আপাতত মিটার গেজেই থাকো না রূপু।

বেশ তাই হবে। কিন্তু আমার পুরস্কারটা?

বলছি তো হোটেলে গিয়ে দেবো।

ঠিক দেবে তো? না হোটেলে গিয়ে আবার গড়িমসি করবে?

ঠিক ঠিক ঠিক দেবো। হলোতো এবার। বা-ব্বা!

বলে মলি ফিক্ করে হেসে ফেললো।

তবে এবার ফেরা যাক—রূপক বললো, বেশ খুশী হয়েই বললো।

রাত আটটা নাগাদ মলি ও রূপক হোটেলে ফিরে এলো।

তারপর দিনই ওরা পানাজী হতে প্লেনে সান্তাক্রুজ এবং সেখান হতে দম্ দম্ ফিরে এসেছিলো।

সাত

এদিকে গোবিন্দ ও লছমন, বীতেশ ও রঞ্জু কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে ইয়ার্কি ফিয়ারকিও করে।

একদিন বীতেশ বলছে রঞ্জুদা, রূপকদা আর মলিদির আড়ালে ওরা সবাই রূপকদা আর মলিদিই বলে, সামনে বলে সাহেবদা আর মেমদি—দুজনের মধ্যে কেমন যেনো একটা····· মানে ইয়ে মতো হয়ে গেছে না?

রঞ্জু কেশে গলাটা সাফ করে বললে—হ্যাঁ ইয়ে মতো হয়েছে বটে তবে বিয়ে মতো হয়নি।

লছ্মন বললে—সাচ্ বাত।

গোবিন্দ বললে—পরভু জগরনাথঃ এবং বলেই তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় হাত জোড় করে কপালে ঠেকালো।

বীতেশ আবার বললে—আমি কিন্তু বিয়ে হলে একটা পাখী প্রেজেন্ট করব মেমদিকে।

পাখী? চিড়িয়া? লছমনই প্রথম বললে।

কি পাখী? বললে রঞ্জু।

—টিয়ে পাখী।

কেন—কেন—টিয়ে পাখী কেন? রঞ্জু তাড়াতাড়ি বললে।

এবার ব্যাখ্যা করে বললে বীতেশ—বিয়ের সাথে টিয়ে মিল আছে না! তুমি তো ইয়ের সাথে বিয়ে মিলালে, কবিতা করলে; আমিও বিয়ের সাথে টিয়ে মিলালাম কবিতা করলাম। যেমন বিয়ে টিয়ে—টিয়ে বিয়ে—বিয়ে টিয়ে—ট্রিয়ে বিয়ে। বীতেশের কবিতার মিল দেখে এবং বলার ঢঙ দেখে সবাই একসাথে হো হো করে হেসে উঠলো।

আর ঠিক এমন সময়ই মোটরের ইঞ্জিনের গর্জন শোনা গেলো। রঞ্জু বললো—রূপকদা ও মলিদি, কাজ সেরে বেড়াতে বেরোল।

বীতেশ বললো—দেখছো তো রঞ্জুদা, দুজনে মিলে কিরকম কঠোর পরিশ্রম করে। কাজেও কমতি নেই, বেড়ানোতেও কমতি নেই। সাবাস্ দিতে হয়।

রঞ্জু বললে—পরিশ্রম না করলে কোম্পানী বড় হয় না। আর না বেড়ালে—গলার স্বরটা একটু ছোট করে এবং ফিস্ ফিস্ করে—মন ও প্রাণ তাজা থাকে না, হৃদয়টা ভরে ওঠে না, বুঝলে বুদ্ধিমান।

হ্যাঁ, এবার পুরোটাই বুঝতে পেরেছি। কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল গো। বীতেশ বেশ হালকা মেজাজে এবং চটুল সুরেই উত্তর দিলো।

এতক্ষণে কিন্তু মলি ও রূপক চলেছে আস্তে আস্তে ড্রাইভ করে। ড্রাইভ করছিলো মলি। রূপকের পরণে আকাশী রঙ-এর দামী প্যান্ট্, গায়ে হাল্‌কা আকাশী রঙের হাওয়াই সার্ট। মলির হালকা নীল রঙের শাড়ি, ম্যাচ করা ব্লাউজ। শাড়ীর আঁচল হাওয়ায় কাঁপছে। চোখে খুব সরু করে কাজল টানা। কপালে গভীর নীল রঙের ছোট্ট টিপ।

হঠাৎ মলিই বললে—আচ্ছা তোমার হাতের মাদুলিটা এখন খুলে রাখতে পারো না? এই আধুনিক কেতাদুরস্ত পোষাকের পাশে মাদুলিটা বড্ড বে-মানান। ওটা কেন পরেছো? খুলেই রাখো না।

রূপক দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করল। কারণ যদিও রূপক কর্মশক্তিতে বিশ্বাস করে তবুও রূপক জানে এই মাদুলিটাই হয়তো তার ভাগ্যের মূলে কিছুটা আছে। আরো জানে মাদুলি হারালে বা খুললেই তার বিপদ, যা মলি জানে না।

তবু মলি পীড়াপিড়ি করে। শেষে রূপক বিরক্ত হয়ে বললে—এখন থাক, পরে একসময় কোমরে পরে নিলেই হবে।

মলি আশ্বস্ত হয়। বলে—আচ্ছা কোমরেই পরো।

তারপর আবার বললে—অনেকদিন কিন্তু কোথাও কাজের

ব্যাপারে বা বেড়াতে বাইরে যাই না। সেই যে দার্জিলিং, পুরী, বোম্বে আর গোয়ায় গিয়েছিলাম একবার! কাজ করে করে একঘেয়েমি লাগছে।

রূপক বললে—কোথায় যাবে?

—মুসৌরী না হয় কাশ্মীরে।

কাশ্মীরেই চল তবে। রূপক সহজেই রাজি হয়ে যায়। এবার মলি খুব মজা করে হাততালি দিয়ে বলে উঠল—বাঃ বাঃ কি মজা! কবে যাবো বলো?

কয়েকদিনের মধ্যেই। ফ্যাক্টরীর কাজের চার্টটা ম্যানেজার অম্বরবাবুকে বুঝিয়ে দিয়ে চলো বেরিয়ে পড়ি।

মলি খুব খুশি হয়ে বললো, বেশ তাই চলো।

আট

এদিকে সাধুর আশ্রমে বেশ কিছুদিন ধরেই অন্যান্য দর্শনার্থীদের সাথে একজন নতুন ধরনের লোককে আসতে দেখা যায়। জামা-কাপড়ে বেশ ফিট্‌ফাট। কিন্তু চেহারাটা যেন কেমন। তার কপালের একদিক কাটা। আবলোশ কাঠের মতো গায়ের রঙ। শরীর বেশ মজবুত ও পেশী বহুল। রোজই সে সাধুজীকে জিজ্ঞাসা করে—আজ হবে তো?

হয়তো সাধু বললে—হবে।

লোকটি চলে যায়।

আবার কয়দিন পর আসে। আবার অন্যান্য অনেক কথার ফাঁকে সাধুজীকে বলে—আজ হবে তো বাবা?

হবে। সাধুজী উত্তর দেয় নির্দ্বিধায়।

তারপর সে চলে যায়।

আবার হয়তো একদিন এসে বলে—আজ হবে তো সাধুজী?

সাধুজী হয়তো বলে—না হবে না।

আবার সে চলে যায়।

যাবার সময় মাঝে মাঝে আশে পাশে কাকে খোঁজে ও। কিন্তু দেখতে পায় না তাকে। মাত্র একদিনই সে দেখেছিলো তাকে। সেই একদিনই দেখে তার কামনা ও লালসা এতো উত্তুঙ্গে উঠে আছে যে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে যেমন করেই হোক ঐ মেয়েটিকে তার চাই-ই। এক রাতের জন্য হলেও চাই। মেয়েটিকে এমনই নজরে ধরে গেছে তার।

এই মেয়েটি হলো আমাদের পরিচিত মলি।

আর এই লোকই হলো খিদিরপুরের ডক এলাকার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ীর আড়ালে কুখ্যাত গুণ্ডা কালিঞ্জা সর্দার। তার বাবা হিন্দুস্থানী, আর মা বাঙালী মুসলমান।

নয়

একদিন হাওড়া স্টেশন হতে "হিমগিরিতে" চেপে সোজা জম্মুতে চলে এলো রূপক ও মলি। সেখানে থাকলো একদিন। দেখলো বিভিন্ন সৌন্দর্য্যময় জায়গা।

গেলো জম্মু হতে কিছুদূরে উদমপুরের বিখ্যাত মার্কেটে। সেখানে কিছু শপিং করলো উভয়ে মিলে।

পরের দিন বিকেলের মধ্যেই কাশ্মীরে এসে পৌছল রূপকও মলি। ডাললেকে সুন্দর দেখে একটি হাউস বোট করে রইলো তারা। ডাললেকের এখানে সেখানে ছড়ানো আছে অনেক হাউস বোট।

লেকের জলে রাতের চাঁদের আলো পড়ে কেমন ঝিল্‌মিল্ করে, সৃষ্টি করে কেমন মায়াজাল আর নানা মনোরম শোভা, তা তারা দেখলো প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে, বিভোর হয়ে।

প্রকৃতির অপরূপ স্নিগ্ধতায় মুগ্ধ হয়ে মলি আপন মনে গান গেয়ে উঠলো—

এই রাত ডাকে আমায়
ওই চাঁদ ডাকে আমায়
ওরে আয় ওরে আয়
কাছে আয় কাছে আয়॥
স্বপনেতে রঙিল
আকাশের ওই নীল,
জলেতে ঝিল্‌মিল
মন কারে চায়॥
এই রাত ডাকে আমায়······

রূপক তন্ময় হয়ে শুনলো গানটি।

একসময় মলি রূপককে বললে—দেখেছো, এই রাত আর ওই চাঁদ যেনো চুপি চুপি কথা কইছে।

রাত আর চাঁদে ভাব আছে কিনা তাই। বললো রূপক।

তোমাতে আমাতে নেই?

কি নেই?

ওই যে তুমি বল্‌লে—রাতে আর চাঁদের মধ্যে কি আছে।

কি আছে বল্‌লাম?

এবার অভিমান করে মলি বললে, জানিনা যাও।

ও ভাব। তোমাতে আমাতে? আছে আছে, বলেই চট্‌ করে দু'হাত বাড়িয়ে মলিকে ধরে কাছে নিয়ে এলো রূপক।

মলি বললে—ছাড়ো ছাড়ো। আঃ কি হচ্ছে।

রূপক কিন্তু ছাড়লো না মলিকে। সে তার কপালে গালে ওষ্ঠে কয়েকটি উষ্ণ চুম্বন এঁকে দিলো।

মলির মুখ রক্তিম হয়ে গেলো লজ্জায়। সে ছাড়া পেয়ে এক ছুটে পালিয়ে গেলো সেখান হতে।

তারপর দিন তারা গেলো নিষাদবাগ। দেখলো নানান রঙের

ফুলের বাহার। ভূ-স্বর্গ হলো প্রকৃতির রাজ্যের রাণী। প্রাকৃতিক পরিবেশে নিষাদবাগ্ অপূর্ব্ব। পাশেই চাস্‌মাসাই। সেখানে গিয়ে পান করলো অঞ্জুলিভরে ঠাণ্ডা পাহাড়ী জল।

দেখলো তারা গুলমার্গ। সেখানেও গুলমার্গ তার অজস্র সৌন্দর্য দিয়ে ওদের মুগ্ধ করলো। দেখলো গুলমার্গের উপরিভাগে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু সবুজ ঘাসে ঢাকা গল্‌ফ খেলার মাঠ যার ডিজাইন ও তৈরি করেছেন স্বয়ং পিটার টম্‌সন।

পরদিন দেখলো পহেলগাম এর ভেড়ার পাল। দেখলো ভেড়ার গায়ের লোম ছেঁটে নিয়ে থরে থরে শুকোতে দেওয়া, দেখলো অমর-নাথ যাওয়ার পাহাড়ী রাস্তা। দেখলো পুঞ্চ এলাকা। আর দেখলো শাপ্‌লা শামুকে শালুকে ভরা খুশীখুশী নাগিন হ্রদ, অনন্তনাগ ও ভুবন ভোলানো সৌন্দর্যে ভরা শুনমার্গ।

আরও দেখলো কচি কচি ঘাসে ঢাকা সবুজ সবুজ পাহাড়। বরফ দিয়ে যেনো সদ্য ঢাকা সাদা সাদা পাহাড়। আকাশ ছোঁয়া চিনার গাছ। বিশাল আকাশের নীল নীলিমা আর পাহাড় থেকে লাফিয়ে-পড়া ঝরনা ধারা।

তারা দেখলো—ঝিলম্ নদীর কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ জল, নৌকো বেয়ে ফল মূল ফুল নিয়ে আসা কাশ্মীরের বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় পুরুষ ও দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী-সুন্দরী রমনীদের।

একদিন মলি পছন্দ করে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিষ ও একটা শাল কিনলো। কেনা কাটার পর মার্কেট হতে বেরুতেই কে যেনো পিছন হতে ডাকলো—এই মলি, ম—লি।

ডাকটা প্রথম রূপকই শুনতে পেলো। সে মলিকে বললো-কে যেনো তোমায় ডাকছে মনে হলো।

মলি পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলো—উগ্র আধুনিক পোষাকে সজ্জিতা, চুল বব্‌ড্ করা ছাব্বিশ সাতাশ বছরের এক যুবতী ওর দিকে ছুটে আসছে, কাঁধে একটা বড় ফ্লাস্ক ঝুলছে। হাতেও বেশ

বড় একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। ছুটন্ত অবস্থায় বারবার শাড়ীর আঁচল কাঁধ থেকে খসে পড়ছে আবার সে তুলে দিচ্ছে। তার পেছনে স্যুট কোট পরা প্রায় পঞ্চাশ বছরের এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকও জোর পা চালিয়ে এদিকেই আসছে।

ভদ্রলোকের গায়ের রঙ রোদে পোড়া তামাটে। যুবতীটি উজ্জ্বল শ্যামল, কিন্তু সুন্দর ফিগারের। এক কথায় বলা যায় পুরুষের নিকট আকর্ষনীয়। এবং তার দেহের এই আকর্ষণ সম্বন্ধে মহিলাটিও সচেতন। প্রথম দৃষ্টিতেই তাকে প্রগলভা বলেও মনে হয়।

যুবতীটি কাছে আসতেই মলি আবেগ ভরে বলে উঠলো—আরে শেলী যে। তুই কবে এলি? কোথায় উঠেছিস?

যুবতী মানে শেলী হাঁপাতে হাঁপাতে বললে-দাঁড়া দাঁড়া, একটু জিরোতে দে। পেছনের ভদ্রলোককেও আসতে দে। বেচারাও হয়তো হাঁপিয়ে উঠেছে। তারপর বলল—এসেছিতো দিন পনেরো হলো, উঠেছি হোটেলে, এমবাসী হোটেল।

ততক্ষণে পেছনের ভদ্রলোকও এসে পড়েছেন। শেলী বললে—দূর থেকে তোর হাটার ষ্টাইল দেখেই বুঝেছিলাম এ মলি না হয়েই যায় না। আর একটু হলেই তোরাতো বাঁক ঘুরে আড়ালে চলে যেতিস। তাই চেঁচিয়ে ডেকে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসেছি। দাঁড়া আগে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এই ভদ্রলোকের নাম সোমেশ. সোমেশ মিত্র, ওরফে ডগলাস মিত্র, আমার বেটার হাফ। দিল্লি য়ুনিভার-সিটির এক সময়কার খেলাধূলার ব্লু, বর্তমানে জে, এস, জি, জি-এর বড় অফিসার, শেয়ার স্পেকুলেটার, একসেট্‌রা একসেট্‌রা। তারপর ঘাড়টা একটু একদিকে হেলিয়ে মলির দিকে চোখ বড় করে তাকিয়ে ও একটু মিষ্টি হেসে শেলী আবার বললে—ত্থ'বছর ধরে একসাথে আছি।

আর সোমেশ, এই হচ্ছে মলি, বিখ্যাত মলি রায়। কলেজ সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট। প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ধীরেনবাবুর, একমাত্র

কন্যা। আমার কলেজ মেট ও একান্ত বন্ধু—কলেজ ফাংশনে ড্যান্সও করেছি বহুবার—ও ভারত নাট্টম আমি ক্যাবারে, আর এক-সাথে গেয়েছি গানও। এর কথা তোমাকে বহুবার বলেছি।

সোমেশ হাত বাড়িয়ে দিল মলির দিকে। মলি হাত বাড়িয়ে শেক হ্যাণ্ড করল।

রূপক এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলো। এবার মলি রূপককে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলো শেলী ও সোমেশের সাথে। মলি বললো—এই হলো রূপক দত্ত, আমার বিজনেস্ পার্টনার ও ওয়েল উইশার। রূপক হাত জোড় করে নমস্কার করলো। প্রতিনমস্কার করার সাথে সাথেই শেলী বলে উঠলো—শুধু বিজনেস পার্টনার? ওয়েল উইশার? লাইফ পার্টনার নয়? তারপর রূপকের দিকে এক ঝলক্ মারাত্মক দৃষ্টি হেনে বললে—কি মশাই, লাইফ-টাইফ নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করুন। মলির ওয়েল উইশারের মধ্যে যেন আমি কেমন একটু সুন্দর সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি। দেখতেও তো একেবারে ময়ুর ছাড়া কার্ত্তিক ঠাকুরটি যেনো।

এবার রূপকের দিকে তাকিয়ে শেলী তির্যক ভাবে হেসে উঠলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে সবাই প্রান খোলে হেসে উঠলো।

শেলী বললে—আসুন রূপকবাবু একটু গল্পকরা যাক। বলে শেলীই এগিয়ে গেলো রূপকের দিকে। যেতে যেতে ফিস্ ফিস্ করে মলিকে বললে, কিরে আপত্তি আছে নাকি?

মলি লাল হয়ে বললে—যাঃ তুই ভারি অসভ্য হয়েছিস্ তো।

শেলী তারপর সোমেশের দিকে চেয়ে বললে—ইউ বেটার টক্ উইথ মলি, মাই লাভ্‌লি মলি।

মলি তখন সোমেশকে বললে—আসুন সোমেশবাবু আমরা গল্প করতে করতে চলি।

শেলীও কথা শুনে মলিকে বললে—ইয়েস্ ইয়েস্ মলি, ক্যারী অন্, বাট ডোণ্ট গো সো ফার। বলে নিজেই হেসে উঠলো এবং মলি

সোমেশ রূপকও সে হাসিতে যোগ দিলো।

তারা সবাই গল্প করে হাঁটতে হাঁটতে পাশের একটা পার্কের অপেক্ষাকৃত নির্জন একটা কোনায় গিয়ে দাঁড়ালো।

রূপক বললে—ঘাসের উপরেই বসা যাক। বেশ আয়েস করে পা ছড়িয়ে বসা যাবে।

সবাই তাতে সায় দিলো।

পার্কটা বেশ সুন্দর। নানা রঙের ফুল ও গাছ লতাপাতা দিয়ে সাজানো। বিভিন্ন বেশভূষায় ছেলে মেয়েরা এখানে সেখানে বসে গল্প করছে। কেউবা খিল্ খিল্ করে হাসছে। কেউবা গুন্ গুন্ করে গানের কলি ভাজছে।

তখনও সন্ধ্যা হয়নি। পার্কের আলোগুলোও জ্বলেনি। একদিকে মলি আর সোমেশ অন্য দিকে শেলী আর রূপক মুখোমুখি বসে গল্প করছে। শেলীই কথা বলছে বেশী। সে আজ খুব প্রগলভ। আর হাসছেও প্রচুর। কথাও হলো অনেক। যার যার দেশের কথা, পুরোনো দিনের কথা, কলেজের কথা, সমাজের কথা, পার্টি ও সোসাইটির কথা ; আর হোল খেলা ধূলার কথা, হলো জীবন নাটকের কথা এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের।

সূর্য অদূরে পাহাড়ের কোনায় ঢলে পড়ে অস্ত যাচ্ছে। হাল্কা ফিরোজা রঙের শাড়ীর মতো পাতলা আঁধার নামছে ধীরে ধীরে পার্কের কোনায়, গাছ-গাছালির মাথায় ও পাহাড়ের পাদদেশে।

শেলী হঠাৎ মিটার বাঁধা ডবল ফ্ল্যাক্সটা বের করে সবার দিকে তাকিয়ে বললে—এনি ড্রিঙ্ক্স্, ওয়াইন অর কফি? হট্ অর কোল্ড? একটাতে আছে পাঞ্চকরা ঠাণ্ডা স্কচ্ আর একটাতে আছে গরম কফি।

রূপক বললে কফিই হোক।

হোয়াই নট্ ওয়াইন, বললে সোমেশ—এবং বলেই চাইল মলির দিকে। মলি কিছুই বললে না।

শেলী মুখে ভঙ্গিমা করে বললে—সেটি হবে না। আজ এই

আনন্দের দিনে আমি ওয়াইন দিয়েই সবাইকে আপ্যায়ন করবো। আবার কবে দেখা হবে কে জানে। তারপর রূপকের দিকে চেয়ে বললে—আজকের দিনটি তো স্মরণীয় করে রাখতে হবে, নয় কি?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—বললে সোমেশ আগ বাড়িয়ে।

তবে আর কথা নয়, বলেই শেলী একপাত্র এগিয়ে ধরলো রূপকের দিকে, আর এক পাত্র মলির দিকে।

অগত্যা মলি ও রূপককে হাত বাড়িয়ে নিতে হল পান পাত্র দুটি। রূপক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো মলির দিকে। মলি বললে—চালিয়ে যাও, তবে বেশী নয়। সেবার দার্জিলিং-এ তো নেপালী রাজ বাহাদুর থাপার পরামর্শে কিছুটা অভ্যাস করেই ছিলাম। যা শীত ছিলো না! একেবারে হাড় কাঁপানো শীত। শ্যাম্পেনটা খেয়ে তবু কিছুটা চাঙ্গা হওয়া গিয়েছিলো।

এদিকে শেলী সোমেশও নিজেদের জন্য দুটি পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করলো।

তারপর শেলী সবার গ্লাসের সংগে নিজের গ্লাস আলতো ভাবে ছুঁইয়ে—ফর আওয়ার ফ্রেণ্ডস্ শেক্—ফর আওয়ার হেলথ্ শেক—ফর আওয়ার লাইফ শেক এণ্ড আওয়ার বিলাভেড্ গড জেসাস্ শেক বলে গ্লাসে চুমুক দিল।

সাথে সাথে সবাই যে যার গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়ালো। শেলী আর একগ্লাস করে অফার করছিলো সবাইকে। কিন্তু কেউ নিতে রাজী হলো না। তাই সে নিজেই এক গ্লাস ভর্তি করে ঢক্ঢক্ করে গলায় ঢেলে দিলো। তারপর আরও একগ্লাস।

মলি আতকে উঠে বললো—কি করছিস্ শেলী। যদিও মলি জানে শেলীদের মত এংলো ইণ্ডিয়ান সমাজে ড্রিঙ্ক নিন্দনীয় তো নয়ই বরং এদিয়েই তারা অতিথিদের অভ্যর্থনা করে এবং শেলীরও ড্রিঙ্কের অভ্যাস আছে। তবু বেসামাল হবার ভয়েই মলি বললো।

চুপ্। "আই উইল ড্রিঙ্ক লাইফ টু দি লীজ।" জীবন পাত্রের

তলানিটুকু পর্যন্ত আমি পান করবো। কি বলেন রূপক বাবু?

এবার শেলীর কথায় সামান্য জড়তা লক্ষ্য করা যায়। শেলীর কথার উত্তরে রূপক বললে—আমিতো গ্লাসের উপরটুকুতেই হাত রেখেছি—উপর টুকুই দেখেছি। নিচের দিক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি এখনও এবং বলেই মলির দিকে আড় চোখে তাকালো একবার। মুচকি হেসে মলিও মুখ ঘুরিয়ে নিলো। এই চাওয়া এবং হাসিটুকু কিন্তু বহু কিছুর অভিজ্ঞ শেলীর চোখ এড়াল না। সে যা বুঝবার তা বুঝে নিলো। এবং সাথে সাথেই বলল—বাঃ বাঃ বেশ বলেছেন তো। র-সি-ক বটে। শুধু উপরটুকুন······বাট্···তলেইতো·· আসল মাল থাকে। কলকাতার ডালের মজা জলে, বৃষ্টির জলে। সব জায়গারই ঘোলের ম-জা তলে, বেশতলে···আর সব প্রেমেরই আসল মজাও তলেই, অনেক তলে।···আই মিন্ গভীরে···ডিপ্·· এ।

বাট্ ইট ইজ ব্যাড্ মলি। ইট···ইজ ব্যাড্। তারপর হঠাৎ চকিতেই শেলী জড়তা কাটিয়ে সোমেশের দিকে তাকিয়ে বললে—তোমরা দুজনে এবার একটু পার্কের অন্য দিকে যাওতো। আমরা দুই বান্ধবী মিলে এখন জীবন নাট্য মঞ্চের অন্য কথা পাড়বো। জায়গাটাও মোটামুটি নির্জনই আছে। তোমরা দুজনে বেশ কতক্ষণের জন্য ঘুরে এসো। প্লীজ।

সোমেশ রূপক সে কথা শুনে অন্য দিকে ঘুরতে চলে গেলো। শেলী ও মলি পাশেই লতাগুল্মে ভরা অপেক্ষাকৃত আরও একটু নির্জন জায়গায় বসলো।

তারপর শেলী আর একগ্লাস ভর্তি করে মলির দিকে বাড়িয়ে দিলো। মলি খেতে চাইলো না। বললে—আমার তো ড্রিঙ্ক করার খুব প্রাকটিস্ নেইরে। তবু শেলী বারবার বলতে থাকলো। মলিকে তাই সামান্য একটু খেতেই হলো। শেলীও আর এক গ্লাস নিজের গলায় চালিয়ে দিলো। মলি বললে—তুই এতো ড্রিঙ্ক করা প্রাকৃটিস করলি কি করে? আর এতো ড্রিঙ্ক করিসই বা কেন?

শেলী বললে—সে কথা পরে বলবো। তারপর বললে, কি-রে, রূপকবাবু কি বললেন?

কি? মলি না বোঝার ভান করলো।

ন্যাকা আর কি?

সত্যি বুঝতে পারছি না। কোন্‌টা?

ঐ যে উপর টুকু পেয়েছি বললেন। কতটুকু দিয়েছিস্ বল্‌না?

যা! কি আজে বাজে বকছিস্?

বলবি না?

ও সব কথা কি বলা যায়? আমার ভালো লাগে না বলতে।

নিশ্চয়ই বলা যায়। বান্ধবীর কাছে বলা যায়। আমি তো মেয়ে, তোর বন্ধু। ছেলেরা নিজেরা বলাবলি করে না নিজেদের কথা?

তা আমি জানি না, মলি বললে। বলেই মলি সাথে সাথে প্রশ্ন করলে—তুই বলতে পারিস তোর সব কথা?

নিশ্চয়ই পারি। আগে তুই বল। তারপর আমি সব বলবো। সব। এতক্ষণে মলিরও দেহেমনে স্কচ্—হুইস্কির কিছুটা গোলাবী ছোঁয়া লেগেছে। সে মাথা নিচু করে শেলীর চোখের দিকে না তাকিয়ে লজ্জা জড়ানো কণ্ঠে বললে, অনেকদিন ধরেই তো রূপকের সাথে ব্যবসায় জড়িয়ে আছি। হালফিলে একটু কিস্ টিস্ খায় আর কি? এবং হঠাৎই খায়। অতর্কিতে।

আজ্ঞে না! হঠাৎও না এবং অতর্কিতেও না। তুই খেতে দিস্ তাই খায়।

না-না। আমি মোটেই খেতে দিই না। মলি আরক্তিম হয়ে ও জোর করে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানালো।

তবে কি জোর করে খায়? শেলী বললো এবং ভেংচি কাটলো একটা।

ঠিক তা না।

তবে ? শেলী মুচকী হেসে চোখ বড় বড় করে তাকালে মলির দিকে।

আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে ও যে চায় সেটা আমি বুঝি।

আর রূপক বাবুও বুঝে তুমি যে চাও। এবং তুমি আগেই এটা তাকে বুঝতে দিয়েছো।

ন্যাকা কোথাকার! শেলী আবার বললে বিজ্ঞের মতো।

পুরুষরা যে আগে চায়রে শেলী।

মোটেই না। তোমার নিকট হতে যে কোন ভাবেই হোক কোনো ইংগিত পেয়ে সে অগ্রসর হয়েছে। নতুবা পুরুষের সাধ্য কি এগোবে ?

আমি তো কোন ইংগিত দেইনি রূপককে।

আলবাৎ দিয়েছো। তোমার অজান্তেই দিয়েছো। হয়তো তুমি নিজে ভাবতেও পারোনি। পুরুষ তখনই অগ্রসর হয়, যখন সে বুঝতে পারে এই নারী তাকে ফিরাবে না। বুঝলি ? তারপর গলার স্বরটা নিচু করে শেলী বললে, প্রেম টেমের ব্যাপারে প্রথম দিকটায় পুরুষরা বড্ড দুর্বল ও বোকা. এটাও জেনে রাখ্। দেখতে পাস না, প্রথম দিকটায় তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে পুরুষদের কথাগুলি কেমন জড়িয়ে যায়, আমতা আমতা করে কথা বলে, আর শুধু হাঁপায়। মেয়েরা কিন্তু আমতা আমতাও করে না, তাড়াতাড়িও করে না—মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ শোনে, তারপর যখন বলে একবারেই সবটুকু বলে ফেলে এবং স্পষ্ট করেই বলে।

আচ্ছা প্রেম সম্বন্ধে তোর ধারনাটা কি শেলী ?

শেলী বললে—আমার মনে হয় উঠতি যুবক যুবতীর প্রেম নিছক একটা ভেক কথা। হেভেনলি লাভ বা স্বর্গীয় প্রেম পার্থিব পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের জীবনে হয় না। সাধারণ মানুষ তো সন্ন্যাসী বা সংসার বিবাগী নয়! তার কামনা বাসনা বা সাংসারিক জীবন যাত্রা বেশ প্রখর। রূপ যৌবন বা কামনা বাসনা ছাড়া প্রেম ভালোবাসা হয়

বলে আমি মনে করি না। স্বভাব কবি গোবিন্দ দাসের সেই বিখ্যাত লাইনটা জানিস তো—"আমি তারে ভালোবাসি অস্থি মাংস সহ।" তার মানে দেহ ছাড়া প্রেম হয় না। প্রেমের সঙ্গে দেহের যোগ নিবিড়।

আর এই কামনার সাথেই প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে থাকে সৌন্দর্য। সৌন্দর্যই তো কামনা। আর কামনাই তো সৌন্দর্য। সৌন্দর্য নেই তো কামনা উঠে গেলো, কামনা নেই তো প্রেমও উড়ে গেলো—অর্থাৎ ফুরুৎ হয়ে গেলো। যেমন ধর, একটি মেয়ে ও একটি ছেলে পরস্পরকে ভালোবাসে। হঠাৎ ছেলেটার বা মেয়েটার এক্সিডেণ্ট হয়ে হাত দুটো বা পা দুটো কাটা গিয়ে সে প্রতিবন্ধী হয়ে গেলো। অথবা বসন্ত হয়ে মুখটা বিশ্রী হয়ে গেলো। নয়তো নর-নারীর যে-সৌন্দর্য চুলে বাড়ায়, সেই চুলটাই একদম উঠে গেলো। তখন দেখবি এক মুহূর্তেই এতোদিনের সিনেমা দেখা, লেকের ধারে বসা, আলু-কাবলি খাওয়া, কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা বা নির্জনে গঙ্গার পাড়ে বসে চাঁদ দেখা বা গান গাওয়ার যে প্রেম-প্রেম খেলাটা তৈরী হয়েছিলো—তা যেন হঠাৎ না হলেও আস্তে আস্তে উঠে গেলো।

কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও প্রেম যে মরেনি বা ভালোবেসেই বিয়ে হয়েছে, ঘর সংসার করেছে, ছেলেমেয়েও হয়েছে এরূপ দৃষ্টান্তও তো আছে—বললে মলি দৃঢ়ভাবেই।

হ্যাঁ আছে, তাও আমি অস্বীকার করছি না। তবে সংখ্যায় এতো কম যে কোনো পারসেণ্টেজে তা আসে না। বলতে পারিস এটা নিয়মের ব্যতিক্রম। শরৎচন্দ্র লিখে গেছেন, ভালোবাসা এক ও রূপের মোহ আর। আরে বাপু মোহটা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু রূপ এবং গতরে একটু যৌবনও যদি না থাকে, তবে শুষ্কং কাষ্ঠং এর সাথে প্রেম বা ভালোবাসা হয় কি করে মলি? নীরসঃ তরুবরঃ হলেও না হয় একটা কথা হতে পারতো।

আর সবাই তো আমরা রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবও নই। অষ্টম

এড্ওয়ার্ড যে সিম্‌সনের জন্য রাজত্বটা ছেড়ে দিয়েছিলো, যা নাকি "যাযাবর" লিখে বিখ্যাত হয়ে গেছেন, সেও ওই রূপ আর যৌবন সিম্‌সনের ছিলো বলেইরে। সিম্‌সন যদি কানা টেরা বা খোঁড়া হতো তা হলে হয়তো অন্য রকম হতো। অর্থাৎ রাজত্বটা টিকে থাকতো। ফস্‌কাতো না।

তুই এসব কথা, নতুন নতুন যুক্তি শিখলি কি করে? বললে মলি?

কিছুটা বিভিন্ন বই পড়ে, কিছুটা বাস্তব অভিজ্ঞতায়, কিছুটা শুনে শুনে, আর বেশ কিছুটা সমাজের ভিতরটাকে গভীরভাবে দেখে। তুই কি মনে করিস্, ফুটন্ত বয়সে প্রাকৃতিক নিয়মেই যুবক যুবতীর দেহটা যেই লাউ ডগার মতো ফন্‌ফনিয়ে বেড়ে গেলো, আর অমনি গুণগুনিয়ে প্রেমের ভোমরা মনের মাঝে গান গেয়ে উঠলো, তেমনি মনটাও চন্‌মনিয়ে উঠে প্রেমের ঢলে একেবারে গম্‌গমিয়ে উঠলো? প্রেমটা অত সহজ জিনিস নয়রে! দেহটা বাড়লো ঠিকই, মনটাকেও বাড়তে দে। বড়ো হতে দে।

আমার তো মনে হয়—আবার বলল শেলী—বিয়ের আগে যে প্রেম, সেটা প্রেম-প্রেম-খেলা। এর ভেতর অবচেতন মনে হলেও রূপ যৌবন লুকিয়ে থাকেই। সত্যিকারের প্রেম হয় বিয়ের পরে, একত্রে ঘর সংসার করতে করতে এবং সন্তান জন্মের মাধ্যমে। তখন চুল উঠে গেলে বা হাত পা বাদ হয়ে গেলেও প্রেম মরে না। বরং গ-ভী-র হয়।

শ্রদ্ধেয় অনুকূল ঠাকুরের একটা কথা আমার বেশ ভালো লাগে —"Sex-decency invokes the urge to beautify civilisation."

ব্বাঃ, বেশ তো! মলি আবেশভরা কণ্ঠে বললে শেলীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে।

এই দেখ না, আমরা আধুনিক মেয়েরা কি করি, শেলী আবার শুরু করলো। কথা বলা ওকে যেনো পেয়ে বসেছে। প্রথম

বিয়ে হয়। সেই পুরুষকে দিয়ে প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় দু'একটা সন্তান আদায় করার পরই ছেলে মেয়ে নিয়ে এমন মেতে যাই না তখন আর ওই পুরুষটার কথা এতো মনে থাকে না। মনে অবশ্য ঠিকই থাকে, তবে অনেকটা হাল্‌কা চালে থাকে। তারপর মেয়ের বিয়ে দেই। কাঁদি। আবার কান্না একসময় থেমেও যায়। ছেলের বিয়েও দেই। বৌ আনি। ব্যস। শুরু হল গণ্ডগোল। নতুন বৌ ছেলের দখল নেয়। চাবির গোছা চায়। ছেলেও হয়তো তলে তলে সায় দেয়। আর দেবেই বা না কেন? তাকে নিয়েই তো সে সারাজীবন থাকবে। আর আমি যে আমার মুখেরটা ঠোঁটেরটা নিজে না খেয়ে ওকে দিনের পর দিন খাইয়েছি; সে যেনো ওর সেই কথাটা মনে রাখতেই চায় না! তবে সংসারে সব ছেলেরাই যে তা করে তা-ও অবশ্য আমি বলছি না। কিন্তু বেশীর ভাগই করে যে। আর বেশীর ভাগটাই সাধারণত মাপ কাঠিতে ধরা হয়। সব যুগে এবং সব দেশে এটাই নিয়ম হওয়া উচিত।

তারপর এলো সেই দিন—যখন ছেলে ও ছেলের বৌয়ের সাথে. মা বড় না বৌ বড়, মনে মনে এই অভিমান নিয়ে তুমুল ঝগড়া হলো, তখন আমার মনে পড়ে সেই স্বামী ভদ্রলোকের কথা--যার কথা এতোদিন প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। ইত্যবসরে পার হয়ে গেছে বিশ পঁচিশটা বছর। তখন বেশী করে মনে পড়ে তাকে—তার সেই মুখখানাকে—যে মুখটা প্রথম যৌবনে সোহাগে সোহাগে ভরিয়ে দিয়েছিলো দিবস রজনী। সেই মুখখানাকেই তখন অবলম্বন হিসাবে খুঁজি। পাকা চুল দাড়ির মাঝেও টর্চের মতো তীব্র দৃষ্টির আলো ফেলে খুঁজে পাই সেই মুখ। ইত্যবসরে আমাদেরও যে চুলে পাক ধরে গেছেরে। হয়তো বাড়ীর এক কোণের ঘরে যেখানে কর্তা বসে আছে সেখানে গিয়ে বলি,—

কি গো মুখখানা যে বড্ড রোগা বোগা দেখাচ্ছে আজ। অসুখ বিসুখ করেনি তো?

ওই ঘরে কিন্তু রোজই গিয়েছি। অনেকবার করেই গিয়েছি, কিন্তু এমন করে বলিনি বা কর্তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিওনি। আজ দেখছি এবং বলছি। কেন বলছি? সেই যে, ছেলের সাথে, বৌয়ের সাথে, নাতি নাতনীদের সাথে, দিন দিন বেশী করে থেকে থেকে—কর্তাতো তখন সাইফার—টের পেয়ে গেছি ছেলে এখন বৌয়ের, আমার চেয়ে তার দখলই বেশী। তখনই আমাদের নারী সুলভ মন বা জেলাসি যাই বলিস ও মাতৃত্বের ঢেলা পুঞ্জীভূত অভিমান হয়ে বুকটাকে দুমড়ে মুচড়ে কণ্ঠ পর্যন্ত ওঠে এলো। সুতরাং যাই কোথায়? কোথায় আবার তারই কাছে, যার কাছে প্রথম যৌবনের মধুময় দিনগুলিতে ছিলাম; যে হাত ধরে এনেছিলো আমায়, সিঁথিতে দিয়েছিলো টকটকে লাল সিঁদুরের রেখা পরিয়ে। হয়তো অভিমানে আহত হয়ে কর্তাকে বলি,—দেখলে তো খোকার কাণ্ডটা, সেও কি না বৌয়ের দিকে ঝুঁকেই কথা বলে? তখন কর্তা হয়তো বললেন—এমনই হয়গো খোকার মা, এমনই হয়। এটাই স্বাভাবিক। আর এটা যে কলিকাল সে কথাটা কি ভুলে গেলে? আমাদের খোকাও যে এতোদিনে ছেলেমেয়ের বাবা হয়ে গেছে গো; এই ঘরে বসে বসেই আমি তোমাদের সবই দেখেছি। সবই আমি বুঝি। কর্তা হয়তো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন—আমাদের আর কি! নাতী নাতনী নিয়ে বাকী জীবনটা ঠাকুরের নাম নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারলেই হলো। তুমিও তো এতদিন ভুলেই গিয়েছিলে আমাকে। কিন্তু আমি তো জানতাম—জীবনের শেষ প্রান্তে হলেও তুমি যে আমার কাছেই আসবে। তাইতো আমি খোকার দিকে তাকিয়ে, বৌমার দিকে তাকিয়ে, নাতী নাতনীদের দিকে তাকিয়ে, তোমার দেওয়া বেদনা (?) বুকের মাঝেই লুকিয়ে রেখেছি। কারণ খোকাকে দেখা মানেই তো আমাকে দেখা গো।

তারপর হয়তো দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধা আরো একটু কাছাকাছি ঠেসে বসে অনেক অ-নে-ক দিন পর উভয়ে উভয়ের দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে

থাকলো। আর মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করলো কালের গতির স্রোত কোন্ দিকে। বুঝলি মলি।

শেলী একটানা কথাগুলি বলে এবার একটু দম নিলো। তারপর একটু ভেবে আবার বলল—তবে বুঝলি মলি, আমি যে এতো কিছু বললাম, আমার কথাগুলিই কিন্তু শেষ কথা নয়রে। শেষ নেই যে, শেষ কথা কে বলবে ?

আবার একটু থামলো।

যাক্ এসব কথা, ফের শেলী বললে-যতো ভাববি, যতো চিন্তা করবি এসব কথা, ততই জড়িয়ে যাবি, জটিল হতে জটিলতার মধ্যে ডুবে যাবি।

আচ্ছা, এবার বলতো আর কি কি করেছিস্ ? এবার একদম হালকা এবং স্বাভাবিক ছন্দে বললে শেলী ত্ব'হাতে মলিকে জড়িয়ে ধরে।

কই আর কিছু না তো।

আমি জানি আরো কিছু আছে-শেলী-চোখ বড় করে মলির গা ঘেঁষে বললো।

মোটেই না। বললে মলি।

ঠিক করে বল্ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। শেলী যেন সম্মোহিত করে বলছে মলিকে।

মলি এবার শেলীর মুখের দিকে তাকালো। তাকালো একবার আকাশের গায়ে ভেসে বেড়ানো মেঘমালার দিকে। তারপর মাটির বুকে নরম ঘাসের দিকে তাকিয়ে বললো—একবার শুধু জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতে, চট্ করে হাতটা বুকের উপর উঠে এসেছিলো, এর জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, সত্যি কথা বলছিরে শেলী।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক ঝট্কায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। রূপক পিছু পিছু তাড়া করেছিলো। বলছিলো মলি, শোন, প্লিজ।

আমি দরজা বন্ধ করে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলেছিলাম, পরে শুনবো। বেচারা হাওয়াতে একটা কিল ছুঁড়ে মুখ ভার করে চলে গিয়েছিলো।

সব শুনে শেলী বললো, মরেছিস্ এবং বেশ ডুবেই মরেছিস্। মরেছিস্ যখন আর ভাসবি নারে মলি, ভাসলেই বড় জ্বালা। আঁকড়ে ধরে থাক।

এবার তোর কথা বল শেলী। মলি শেলীকে আদর করে বললে।

হ্যাঁ বলছি মলি, সবই বলছি আজ তোকে। বলবো আমার ভাগ্য-বিড়ম্বনার ইতিহাস। বলবো আমার পতনের দীর্ঘ ইতিহাস। সেই জন্যই তো এতগুলো মদ গিলে নিয়েছিরে! না হলে কি বলা যাবে। আবার কবে দেখা হবে কে জানে!

শেলী একটু চুপ করলো। মনে হলো যেন সে অতীতকে একবার চোখ মেলে দেখে নিলো।

তারপর শুরু করলো.........

কলেজ ছাড়ার পর আমার বিয়ে হলো। দাদাই এ বিয়ে ঠিক করেছিলো। ছেলেটার নাম পিটার। দেখতে ভালো। দাদা বলেছিলো অনেক টাকা। টাকার প্রতি আমার বরাবরই লোভ ছিলো একটা। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই টের পেলাম সে জুয়াড়ী, বড্ড বেহিসেবী এবং পাড় মাতাল।

দাদাকে তুইতো জানতিস্। এক নম্বর শয়তান ছিলো আমার দাদা। বাবা মারা যাবার পর দাদাই সব। অনেক টাকা হাতিয়ে নিয়েছিলো দাদা পিটারের নিকট হতে আমার বিয়ের বাবদ। আর পিটার আমাকে সে সব নিয়ে প্রায়ই মারধর করতো। রাত্রেতো বাড়ীতে প্রায়ই থাকতো না। আজে বাজে পাড়ায় গিয়ে বিশেষ করে পার্ক স্ট্রিটে, রিপন স্ট্রীটে গিয়ে প্রায়ই স্ফুর্তি করতো।

মলি বললে—তোর এই সুন্দর দেহটা দিয়েও কি তুই তাকে ধরে রাখতে পারলি না?

না! সেটাই তো আপসোস রে। আমার এই নিটোল সেক্‌সী-দেহটা দিয়েও আমি তাকে আটকাতে পারিনি।

বাসি ফুলের বাসি মধু ঘুরে ঘুরে খেতে যে ভ্রমর অভ্যস্ত, তার কি টাট্‌কা ফুলের টাট্‌কা মধুতে মন ভরে? অনেক লোক আছে যারা বাসি পচা মাছ তেলে ঝালে নুন পেয়াজ রসুন দিয়ে কষিয়ে রসিয়ে খেতে টাট্‌কা মাছের চেয়েও বেশী ভালোবাসে। এ অনেকটা সে রকমের রে মলি।

সে বিয়ের আগে হতেই বাইরের নেশায় এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো যে ঘরের কোন আকর্ষনই তার কাছে ছিলো না। আমি অনেক বুঝিয়েছিলাম-রে। কিন্তু সে আমার জীবনটা তছনছ করে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিলো, দিনের পর দিন মারধর ও অমানুষিক অত্যাচার করে। আমারও মন বিষিয়ে উঠেছিলো।

তার পরেই ডাইভোর্স। কিছুদিন পর শুনেছিলাম একটা কাঁচা বয়েসের চীনা মোট্‌কা মেয়েছেলেকে নিয়ে সে পার্ক ষ্ট্রীটের পাশেই কোথায় নাকি আছে। তারপর আর খবর রাখিনি!

এখন মাঝে মাঝে তার কয়েকটা মিষ্টি কথাও অবশ্য মনে পড়ে। নেশার ঘোরে মাঝে মাঝে সে কবি হয়ে উঠতো। বলতো, শুধু ব্রা দিয়ে কি তোমার এই ভরা যৌবনের ফোঁস করা বুক পোষ মানে? তোমার টানা টানা চোখ, ভরাট ট্রাঙ্গুলার মুখ, আর উন্নত বুক, আ-হা দেখেও সুখ, মরি মরি দেখেও সুখ। ঠিক সেই মুহূর্তে আমারও বনময়ূরী মনটা নেচে নেচে উঠতো যেনো আমার প্রান পুরুষের পরশে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝলাম, সে সব কিছুই ফল্‌স্ দিয়ে গেলোরে মলি, আমায় ফলস্‌ দিয়ে গেলো।

তারপর? বললো মলি। ভেরী ইনটারেষ্টইং তো। স্পিক্ অন, কুইক্‌। মলির যেনো তর সয়না।

দূর সম্পর্কের মামার বাড়ীতে ছিলাম তারপর কয়েকদিন। মামিমা খুব খুশি মনে মেনে নেয়নি আমায়। প্রায়ই ঝামেলা

পাকাতেন, ঝগড়া করতেন। তবে মামা আমার সদাশিব ছিলেন। দেবতুল্য মানুষ।

সেই সময় আলাপ সোমেশ বাবুর সাথে। নিঃসন্তান, বিপত্নীক। দজ্জাল স্ত্রীর অজস্র অত্যাচারের একটা অতিষ্ঠ করা শব্দময় জ্বালা বুকে নিয়ে ভদ্রলোক ঘুরছিলেন। আর আমার বুকেও ছিল একটা নিশব্দ বেদনার জ্বালা। তাই সামান্য ঘনিষ্ঠতা হলে বিয়ের আলাপ তোলা হলো এবং রেজিষ্ট্রি করে বিয়েও হলো।

বিয়ের কিছু পরেই সোমেশ আমায় নিয়ে বড় বড় কক্‌টেল পার্টিতে, সোসাইটিতে যেতে লাগলো। প্রথম দিক দিয়ে আমার বেশ অসুবিধে হতো। তারপর কিছুটা রপ্ত করে নেওয়ার পর বুঝতে পারলাম সোমেশ আমাকে ও টাকাকে সমান ভালোবাসে। টাকাও আমি সমান সমান। আমার বিনিময়ে যদি টাকা আসে বা টাকার বিনিময়ে যদি আমি সাময়িক হারিয়ে যাই, তবে কিছু যায় আসে না।

আসল কথা, সোমেশকে বড় হবার নেশায় পেয়ে বসেছে। টাকার নেশা। চাকুরীতে তার আরও বড় প্রমোশন চাই। বড় বড় কোম্পানীর টেণ্ডার এবং কনট্রাক্ট অর্ডার পাশ করিয়ে দিয়ে তার লভ্যাংশও চাই। শেয়ার মার্কেটের স্পেকুলেটার হিসাবে ও সোমেশ বেশ বড় চাঁই। ফার্ষ্টক্লাস স্পেকুলেটার। ঐ সব করেক্ট স্পেকুলেশনের বেশ মোটা একটা অংশও তার চাই। আর এসব করতে হলে চাই পার্টি ডিনারে এটেন্‌ডেন্স। হুইস্‌কি ভোদ্‌কা ভ্যাট-৬৯ ভারমুথে অভ্যাস। আর চাই রাতের রমণী। এই রাতের রমণী হতে হবে প্রয়োজন হলে আমাকেই। তা হলেই তো সোমেশ এক এক রাতে দু'হাত ভরে অনেক টাকা লুটে আনতে পারবে।

একদিন অনেক কথার পর সোমেশ বলেই ফেললো—শোন শেলী, এতে দোষ নেই। বোকাদের ঠকিয়ে তাদের টাকা আমাদের

করতে হবে। টাকা যার কাছে আসবে তারই কথা বলবে। তার পর অনেক অনেক টাকার মালিক হয়ে আমরা য়ুরোপ পাড়ি দেবো। সেখানে গিয়ে খুব বড় একটা ফাইভস্টার হোটেল খুলে পায়ের উপর পা দিয়ে আমরা সুখে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবো! জেনে রেখো শেলী, আমি তোমাকে একটুও ঘৃনা করবো না। বরং প্রান দিয়ে ভালোবাসবো এবং বাসিও। মাত্র একফোটা ভালোবাসার জন্য যে আমার বুকটা কেমন হাহাকার করে বেড়াচ্ছে তাকি তুমি বোঝনা শেলী? তবে হ্যাঁ—টাকাকেও আমি ভালোবাসি, ভীষণ ভাবে ভালোবাসি। মাই লাভ্‌লী শেলী, মাই লাভ্‌লী রূপী। আমি তুমি হাজার হাজার রাত একসাথে এক বিছানায় কাটাবো, আর ওই বোকারা না হয় তার থেকে দু চারটে রাত ফষ্টি-নষ্টি, আই মিন ও নলি ফষ্টি-নষ্টি করার জন্য কেড়ে নিলেই। প্রয়োজনে দূর থেকে রূপের ফুলঝুরি ছড়িয়ে দেবে। কিন্তু তার বিনিময়ে আমরা চাই টাকা, প্রচুর টাকা। আর টাকা হলেই মান সম্মান যশ, সব সব। বড়লোক হয়ে যাবো আমরা। বড়লোক: খু-উ-ব বড় লোক।

বলতে বলতে সোমেশের চোখগুলি বেশ বড় হয়ে উঠেছিলো মলি। নতুন টাকার মতো সে সময় তার চোখগুলি চক্‌ চক্‌ করে জ্বলে জ্বলেও উঠছিলো।

আর ওই মুহূর্তে সোমেশের কথায়ও যেন যাদু ছিলো। আমি আবেশ বিহ্বল হয়ে তার কথাগুলো শুনেছিলাম, আর মনে মনে স্বপ্ন দেখেছিলাম—পার্টি ডিনার কনট্রাক্ট ফর্ম য়ুরোপের হোটেল ইত্যাদি!

এরপর শেলী বললে, সত্যি মলি, সোমেশ আমাকে ভালোবাসে প্রাণ ঢেলে। সে ভালোবাসায় কিন্তু এতটুকু খাদ নেই। কিন্তু তবু যে আমি আর পারছিনা মলি। মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করি, এ কি রকম স্বামী, যে অভিসার হতে ফিরে আসা স্ত্রীকে এতো সোহাগ করে, এতো আদর করে, এতো ভালোবাসায় ডুবিয়ে রাখে?

উত্তর পাইনা। কোনো উত্তর পাইনা মলি। শুধু অন্ধকারে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, সোমেশ হয়তো এতটা জানে না বা বোঝে না যে টাকার বিনিময়ে—হয়তো টাকার অংশটা খুবই মোটা—আমার নারীত্বের কতখানি মূল্য তখনকার মতো বিকিয়ে দিতে হয়। আমিও তাকে কোনদিন খোলাখুলি সবটুকু বলিওনি।

তুই প্রথমে রাজি হয়েছিলি কেন? এসব ব্যাপারে মেয়েরা সহজে রাজি হয়? মলি তিরস্কারের সুরে বললে।

এখন ঠিক মনে নেই কেন রাজি হয়েছিলাম। হয়তো বড় হবার নেশায়। টাকার হাতছানিতে। পিটারের অমানুষিক ও অমানবিক অত্যাচারে। পিটার আমার শুধু যৌবন, লুটেছিলো। তখন থেকেই পুরুষ জাতটার উপর মাঝে মাঝে ফুঁসে উঠতাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতাম, যদি কখনো চান্স পাই তবে নিংরে ছিবড়ে সব রস বের করে নেবো এই পুরুষ জাতটার—বিশেষ করে বাসি ফুলের বাসি মধু খেয়ে মাতোয়ালা হয় যারা।

কিন্তু তা পারিনি—বলে শেলী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তার চেয়ে ওরাই আমাকে গিলে খেয়ে ফেললো নেশার ঘোরে।

আবার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানিস মলি? ভাবি, প্রৌঢ় সোমেশের কামনার উত্তাপে আমার দুরন্ত যৌবনের অতৃপ্ত কামনা কি পরিতৃপ্ত নয়? এরও উত্তর খুঁজে পাই না। কারণ আমি তো সোমশকে কম ভালোবাসি না। সোমেশের মতো টাকাকে আমিও ভালোবাসি। আর ভালোবাসি চলন্ত জীবনের দুরন্ত ফুটন্ত যৌবন-কে। এই অশান্ত যৌবনের অতৃপ্তিই কি আমার অবচেতন মনে নিশীথ রাতের নিশাচরীর খোরাক জোগায়?

আমার অবচেতন মনে হয়তো এর একটা উত্তর লুকিয়ে থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু কি সে উত্তর?

সোমেশ বলে, মাঝে মাঝে রাতে ঘুমিয়ে আমি নাকি কি সব বলি

বিড়্বিড় করে। সোমেশ বুঝতে চেষ্টা করে কিন্তু বুঝতে পারে না কিছুই।

তাই বলছি মলি, আমি হারিয়ে যাচ্ছি। আমি হারিয়ে গেছি। নাউ আই এ্যাম এ ফলেন ওম্যান। পারহ্যাপস্ আই হ্যাভ বাঙ্গ-ল্ড্ মাই লাইফ।

সত্যি আশ্চর্য! মলি বললে অবাক বিস্ময়ে। এখনও তো খুলেই কিছু বলিনি। তাতেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিস। একদিনের কথা শোন্। আমার লজ্জার কথা। শুনে ঘৃণা করতে হয় করিস নতুবা ভালোবাসিস্। তুই বন্ধু, তার ওপর মেয়ে। তাই বলতে পারছি। অবশ্য এখন সব কিছুই গা সওয়া হয়ে গেছে। এখন আর একটা বড কিছু মনে করি না। বেটাদের অত্যাচার যখন খুব বোরিং মনে হতো তখন ড্রিঙ্কস্ এর সাথে হয় ক্যান্নাবিস নয় বারবিটিউরেট অথবা অ্যামফিটেমাইনের কিছুটা ড্রাগ নিয়ে নিতেম।

এবার শোন্। মস্ত বড় একটা টেণ্ডার পাশ করাতে হবে "মেসার্স চ্যাটার্জী এণ্ড হ্যারিংটন"—এর মালিকের নিকট থেকে। সব বন্দোবস্ত করে রাত ঠিক বারোটায় মিঃ চ্যাটার্জীর ফ্ল্যাটে গিয়ে ঢুকলাম।

মদ খেয়ে টল্ছেন মিঃ চ্যাটার্জী। আমাকে দেখেই চ্যাটার্জী সাহেব বললেন—আসুন আসুন শেলী দেবী। এনি ড্রিঙ্ক; শেরি শ্যাম্পেন হুইস্কি?

আমি, বুঝলি মলি, বেটাদের ঘৃণা করি—কিন্তু সময় নষ্ট করতে রাজী নই। চোখে তির্যক একটা দৃষ্টি হেনে সোফায় গা ঘেঁষে বসেই বললাম, হট্ হুইস্কি।

হট্ হুইস্কি কথাটার হট্ শুনেই ভদ্রলোক মনে হল চট্ করে উত্তেজিত হয়ে গেলেন এবং এক ঝট্কায় পিঠের পাশ দিয়ে বাম হাতে আমার বাম দিকটা জড়িয়ে ধরলেন। আর ডানহাত দিয়ে এগিয়ে দিলেন আমার মুখের কাছে হুইসকির গ্লাসটা। আমি চট্ করে

খেয়ে গ্লাসটা খালি করতেই, আর এক গ্লাস আমাকে দিয়ে এবং নিজেও এক গ্লাস খেয়ে গ্লাসটা রেখে দিলেন।

এবার তার ডান হাতটা ফাঁকা। প্রথমে আমার চুলগুলি তিনি হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিলেন। তারপর তার মুখটা আমার গালের আরও আরও কাছে আসতে লাগল। ভদ্রলোক সুপুরুষ। বুকের চাপটা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। রঙীন হয়ে উঠ্ছিলো কি আমার মনও? কে জানে? চ্যাটার্জ্জীর দুচোখে তখন স্বপ্নের ঘোর। আমার শাড়ীর অধিকাংশই তখন লুটাচ্ছে। ঘরে জ্বলছে গভীর গোলাপী-রঙের নিশিবাল্ব। তার প্রতিবিম্ব আমার দেহের আনাচে কানাচে। চ্যাটার্জ্জীর চোখও ঘুরছে আমার দেহের ভাঁজে ভাঁজে টর্চলাইটের মত। রোজমাখা গালের দিকে হঠাৎ নজর পড়তেই আবেশময় কণ্ঠে মিঃ চ্যাটার্জ্জী বললেন, এ কি! রুজ মেখে গাল এতো লাল করেছ কেন? এত লাল আমি পছন্দ করিনা একদম্।

আঃ মরণ! বললে মলি।

তারপর শোন্, এই কথা বলেই না ভদ্রলোক আমারই শাড়ীর আঁচল দিয়ে দুই গালের রুজ ঘষে ঘষে মুছে দিলেন। এবং মুছে দিয়েই বললেন, এই দেখো না আমি তোমার তুলতুলে নরম গাল কেমন হাল্‌কা লাল করে দিয়েছি।

তাতেও ভদ্রলোক থামেন নি। স্খলিত পদে টেবিল হাতে মিঃ চ্যাটার্জ্জী একটা ছোট আয়না এনে জড়িত কণ্ঠে বললেন-দে-খো-না-ডার্লি, গাল—দুটো তোমার এমনিতেই কতো—সুন্দর লাল হয়ে আছে।

দেখলাম সত্যি আলতো লাল হয়ে উঠেছে আমার নরম গাল দুটি। ভদ্রলোক মেয়েদের প্রসাধন চর্চ্চার দোকান দিলেও বেশ বড় হতে পারতেন কিন্তু বুঝলি?

চ্যাটার্জ্জী সাহেব এবার মুচকী-হেসে আর এক গ্লাস পান করলেন। আমায়ও এক গ্লাস খাওয়ালেন। উভয়েই এবার ভীষণ

মাতাল হয়ে গেলাম।

এবার চাটার্জ্জী সাহেবের মুখ আমার বুকের স্পষ্ট দুই গোলাধের মাঝে। অনেকটা যেন ঘুমন্ত অবস্থায় আমি অনুভব করছি একটা পুলক, অনুভব করছি একটা শিহরণ। অবশেষে দূর হতে ভেসে আসা একটা মাদলের মৃদু তালের মতো, একটা বাঁশির মিষ্টি সুরের শেষ রেশের মতো, আমি ও আমার সারা অঙ্গ চ্যাটার্জ্জীর সারা অঙ্গের মধ্যে হারিয়ে গেলাম।

যখন ফিরে এলাম গাড়ী করে ভোর রাতে, তখন শীল মোহর করা আশি লাখ টাকার পাশকরা টেণ্ডার আমার হাতের মুঠোয়।

আর একবার। পেটমোটা মিঃ ভাটারিয়ার কাছে গেলাম সেজেগুজে। এটা ছিল একটা দুকোটি বিশলাখ টাকার কনট্রাক্টের ব্যাপার। উনিতো তৈরী হয়েই ছিলেন।

যাওয়ার পর যথারীতি পানাহার হলো। হলো কুশল বিনিময়। তারপর ভদ্রলোকের ইচ্ছা নিওন লাইটের নিচে আমার দেহটাকে ভোগ করা। আমি আপত্তি করলাম। লজ্জা শরমের একটা বালাই আছে তো। ইডিয়ট। নাইট বাল্ব জ্বালাতে বললাম। ভদ্রলোক স্পষ্টাস্পষ্টি বললেন—তুমি রাজি না থাকো কনট্রাক্টে সই হবে না। মদের উগ্র ঝাঁঝ যেন কথাগুলির মাঝে।

অগত্যা আমি চুপ করে রইলাম। মনে মনে গালি দিলাম, উল্লুক কোথাকার। কনট্রাক্টে সই হলো।——তারপর ভদ্রলোক ধীরে ধীরে কাছে এলেন। আমি বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। নেশায় কিছু কিছু টলছিলাম আমি। টলছেন ভাটারিয়াও। তিনি আমার কাছে এসেই আমাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। আমি তন্দ্রাহত হয়ে অনুভব করছি, তিনি ব্লাউজটার হুক্‌গুলি খুলতে দেরী হওয়ায় একটান দিয়ে হুকের সূতাগুলি ছিঁড়ে ফেললেন। ব্রাহীন দেহে বম্বেকাট টাইটফিটিং ৩৪ সাইজ ব্লাউজটা আলগা হতেই··· তিনি দেখলেন আমাকে। কী দুষ্টুরে বাবা। আমার অর্দ্ধ নগ্ন

দেহটা ও নিতম্বদেশ বোধ হয় তার চোখের সামনে একবার ঝিলিক্ দিয়ে গেলো। তিনি একতাল সমুদ্রের ফেনার মতো আমায় নিয়ে সেই নরম বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর মদের নেশায় আমার আর কিছু মনে ছিলো না! বলেই শেলী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

এরপর আরো আছেরে মলি। কতো বিচিত্র কাহিনী, কতো বিচিত্র ইচ্ছা, কতো বিচিত্রই না মানুষ, তা বলে শেষ করা যাবে না। কি বিচিত্র সব ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সাথে এই জীবনের চলার পথে যে পরিচয় হয়েছে মলি তা বলে শেষ করা যাবে না। দিবসে তাদের একরূপ আর রাতে তাদের অন্যমূর্ত্তি। এই মুহূর্তে এক, অন্য মুহূর্তেই আরেক। সবাই যেন এক অস্থির ধ্যান ধারণা ও চিন্তার শিকার। তারা প্লাস্টিক সার্জ্জারী করা হৃদয় ও ক্যামোফ্লেজ করা মন নিয়ে অর্থাৎ নকল হাসি হেসে ও মেকি কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে সমাজে দিব্যি চলে যাচ্ছে দিনের পর দিন। সত্যিকারের উঁচু ধরনের শিক্ষা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আলট্রা ভায়োলেট ল্যাম্প ছাড়া তাদের হৃদয় ও মনকে বোঝা যায় না কিছুতেই।

আচ্ছা মলি, তারা সবাই বলতো আমার নাকি খুব সেক্সি বডি। সত্যি কি তাই?

মলি উত্তর দেয়—তুই তো দেখতে খারাপ নোস। আর পুরুষের চোখে আমরা সেক্স জাগাতে পারলেই হয় তো সেক্সী, বুঝলি না?

তা ঠিক, বললে শেলী। তবে জেনে রাখ, আমার-যৌবনকে আমি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে ফুরিয়ে যেতে চাইনা সাথে সাথেই। তার প্রমান, অত কিছুর পরও এখন পর্যন্ত ধরে রাখা আমার অটুট যৌবন। যৌবনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে মুহূর্তেই বিলীন হতে দেবো না আমি। তাই তো বোধ হয় আমার দেহ পিয়াসীদের নিকট আমি মুহূর্তেই প্রগলভ হয়ে উঠতাম। ফুরিয়ে দিতাম তাদের এক নিমেষেই। ওদের যাত্রা শেষ হলেই তো আমার যাত্রা হতো শুরু, আমার

উচ্চাকাঙ্খার জয় যাত্রা।

একটু থেমে শেলী ফের বললে, কি ভাবছিস মলি? ঘৃণা করবি না ভালোবাসবি?

নারে না। ভাবছি তোকে নিয়ে অনেক তর্ক করা যায় কিন্তু মিমাংসা করা যাবে কিনা!

যদি আমাকে নিয়ে তর্ক করে কোন মিমাংসা করতে পারিস তবে পত্র দিয়ে জানাস। আমার মনে হয় কি জানিস, তর্ক করেও মিমাংসা হয় না রে। শুধু আরও জড়িয়ে যায়।

তুই তো জানিস, ধর্ম বিষয়ে-আমার কোন গোঁড়ামি নেই। বিভিন্ন সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ের বই আমি কলেজে ও য়ুনিভারসিটিতে অনেক ঘেঁটেছি। এই দেখনা—পরশুরাম পিতার কথায় মাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো: আবার বভ্রুবাহন মা চিত্রাঙ্গদার জন্য পিতা অর্জুনকে কি নাজেহালইনা করেছিলো। কোন্ লেখকের লেখাটাকে তর্কের আদর্শ করবি? তোদের শাস্ত্রে অনেক উপাখ্যানও আছে। অথবা কোন্ উপাখ্যানটা বা কোন্ গল্পটা?

কোন কোন উপনিষদ পুরাণ কাহিনীতে দেখা যায় অতিথির সেবায় নিজের স্ত্রীকেও অতিথির শয্যা সঙ্গিনী হতে দেওয়া হতো। বরফ ঢাকা মেরু প্রদেশের কোন কোন গোষ্ঠিতে বন্ধু পত্নীকে তার স্বইচ্ছায় উপভোগ করলে এবং চুম্বনে স্ত্রীর গণ্ডদেশ আরক্তিম হয়েছে দেখলে স্বামী সেই স্ত্রীকে তারিফ করতো। আর অনিচ্ছায় উপভোগে হতো মৃত্যু। জানিস্ তো?

কিছু কিছু দেব দেবী ও মুনি ঋষির চরিত্র চিত্র মোটেই সাধারণের নীতি বোধক নয়। স্নানরতা কার্তিকের পৌরুষ সৌন্দর্যে নাকি দেবীর ভাবাবেগ সঞ্চারিত হয়েছিলো? এর কি কোন বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা যায়? আর মরতে মরণ হল ময়ুরের। সে বহন করলো অভিশাপ। সরস্বতীর বর কে? সরস্বতীকে বলা হয় দেবকুলের 'পুষ্টি'। এই পুষ্টি কথাটার মানে কি রে? এর তো ভালো এবং মন্দ

ত্বভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। সরস্বতী নারায়নকে বিয়ে করতে না পেরে থাকেন চিরকুমারী, আর হন নাকি নারায়নের সহচরী। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত যত পাথুরে মূর্তি পাওয়া যায় আমাদের দেশে, তার প্রত্যেকটাতেই নারায়নের সাথে সরস্বতী আছে এবং পূজিতা হতেন উভয়েই একসাথে! অষ্টম শতাব্দী হতেই মা সরস্বতীর একক পূজোর প্রচলন। অথচ আমরাতো জানি লক্ষ্মী আর নারায়নই আসল। আবার দেখ, দুর্গার বিশভুজা বা দশভুজা মূর্তিতো আছেই, আছে আবার দ্বি-ভূজা মূর্তিও। আবার অষ্ট ভুজার মূর্তিও আছে, তখন তার নাকি মহাসরস্বতী রূপ। মা দুর্গার মহালক্ষ্মী রূপও একটা আছে—জানিস্ ? বৈদিক সাক্ষ্যথেকে প্রমাণ করা যায়, সিংহী ও মেষা ছিলো সরস্বতীর আদি বাহন। সব মূর্তিই কিন্তু ভক্তিভরে পূজিত হয়।

কৌশাম্বিতে পাওয়া তোরমানের শীলমোহরে দেখা যায় লক্ষ্মীর পদতলে আছে গরুড়ের চিত্র। ইলোরার গুহাচিত্রেও লক্ষ্মী গরুড়-বাহনা। অথচ বর্ত্তমান সময়ে আমরা জানি সরস্বতীর হাঁস ও মা লক্ষ্মীর পেঁচাই বাহন। এনমলির অভাব নেই প্রাচীন গ্রন্থে।

মহিষাসুরকে তো তোরা দুরাত্মা বলিস্। কিন্তু সে বীর যোদ্ধা, শিবাংশে জাত। দেবী পুরাণে শিবরূপেই তার ধ্যান করা আছে, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা আছে।

'মহিষস্ত্বং মহাবীর বিশ্বরূপ সদাশিব।
অতস্ত্বং পূজয়িষ্যামি ক্ষমস্ব মহিষা সুর ॥"

আমি কিন্তু তোদের দেবদেবীকে বা কোন ধর্ম্মগুরুকে বা ধর্মকে হেয় করার জন্য এসব বলছি না। শুধু তোকে স্মরণ করিয়ে দিলেম আর কি।

আমাদের খৃষ্টানদের ইহুদীদের মুসা ডেভিড ও গড যীশু আর মুসলমানদের পয়গম্বর প্রভৃতি মহান ধর্ম্মগুরুদের বিভিন্ন রকম বাণী আছে। আমাদের প্রভু যীশুই কি কাশ্মীর বাসীদের

ঘুশ আসফ? আবার তিনিই কি নাথদের ঈশাই নাথ?

আরব কন্যা মুসাইবা পয়গম্বরকে প্রশ্ন করেছিলো—কেন আল্লা-হ্‌র বাণীতে নারীর কোন উল্লেখ নেই, শুধু পুরুষরাই সম্বোধিত। এর পরই দেখা যায় ঐশ্বরিক বাণী সমূহে, "মুসলিমান ওয়া মুসলিমান / মুনিনিন ওয়া মুনিনাত" লেখা হচ্ছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কি সীতা সম্পর্কে নিয়ে কিছু নতুন গবেষণা করেন নি! অধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সাফল্যে পুরানো অনেক ধ্যান ধারনাই কি পাল্টিয়ে যায় নি? উচ্চতর দর্শনের দেশ মুনি ঋষির দেশ। ভারতবর্ষও তো আর্যভট্ট রোহিনী অ্যাপল ইনসাটওয়ান-বি আকাশের বুকে উড়িয়ে দেয় ট্যাঙ্ক তৈরী করে, রাইফেল বানায়। দর্শন দিয়ে তো আধুনিক যুদ্ধ চলে না।

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তি-তারা মন্দোদরী সবাইতো আমাদের দেশে "পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনং" অর্থাৎ সতীসাধ্বী এঁনিয়ে বিতর্ক চলতে পারে না কি? এরূপ কতো উদাহরনই তো দেওয়া যায়। এইসব নিয়ে তো অনেক গবেষণা লেখালেখি চলছেই। সঠিক হদিশ কেউ এখন পর্যন্তও দিতে পারে নি বলেই আমার বিশ্বাস।

বহু লোকের বহু মত, তাই বহু পথ; রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সেই "যত মত তত পথ" আর কি। আবার উল্টো করেও বলতে পারি—যত পথ তত মত। এসবই তর্কের বিষয়, বুঝলি। এর যে কোন্‌টা সঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক তা হলফ্‌ করে বলা সত্যিই কঠিন-দুষ্কর।

তবু বলছি, তর্ক করে যদি তুই কোনদিন আমার ব্যাপারটার একটা সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারিস তবে পত্র দিয়ে জানাতে ভুলিস না যেনো।

তাই হবে। মলি বললে। তবে আমার মনে হয় তোদের এই পথটা ঠিক নয়। ভুল, ভুল পথটা পরিবর্তন কর শেলী। সোমেশ বাবুর বড় হবার নেশাটা এবং তোরও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা বদলা।

আবার কি সেই সুন্দর জীবনে ফিরে আসতে পারবোরে মলি?

নিশ্চয়ই পারবি। জানিসতো, অন্ধকরা আঁধার রাতের বুকেই ফোটে শ্বেত-শুভ্র সুগন্ধি পুষ্প। আবার আঁধার শেষে ভোরের নরম আলোয় সেই পুষ্পেই হয় দেবতার অঞ্জলি।

জানিস মলি—মলির কথা লুফে নিয়ে শেলী বললে—আমিও ফেড্ আপ হয়ে গেছিরে। এখন আমারও মনে হয় আমাদের পথটা ভুলই। সোমেশকে আমি সেকথা বলেছি। সে বলেছে—কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমরা আবার নুতন করে ঠিক করবো কি করা যায়। এবং এই কথা আজকেই হলোরে। তাইতো মনের খুশিতে এবং আশায় এতোক্ষণ এসব কথাই তোকে বললাম। সম্ভব হ'লে আমরা য়ুরোপে পাড়ি দেবো, নতুবা ওয়ালটায়ার চলে যাবো।

তাই যা শেলী। তবে যেখানেই যাস পত্র দিস ঠিকানা দিয়ে।

দেবোরে দেবো। তোকে পত্র দেবো না তো দেবো কাকে? তুই যে আমার সব থেকে বুসমরে। কলেজের কথা কি মনে নেই তোর?

আছেরে আছে। অত সহজে কি সে দিনগুলি ভোলা যায়। বলেই মলি, চোখ বুজে পুরনো দিনগুলি যেন একবার দেখে নিলে মনের আয়নায়।

আচ্ছা মলি কলেজের সেই মেয়েটার কথা তোর মনে পড়ে? ক্লাসে জয়শ্রী জানার পাশে যেই মেয়েটা বসতো। সেই যে কুচি কুচি ঢেউ খেলানো চুল, লম্বা গড়ন, ফর্সা—ধাচের শ্যামলা মেয়েটিরে।

কার কথা বলছিস্, মলি বললে।

আরে সেই যে মিষ্টি মিষ্টি হাসতো, ঝক্‌ঝকে মুক্তোর মতো দাঁত গুলি। কেটে কেটে কথা বলতো। হাসলে পড়তো বাম গালে একটা ছোট্ট টোল। আঃ কি যে নামটা মেয়েটার। আরতি, মিনতি, অনিতা, বীণা, আনু, বেনু, কলি, অলি, অঞ্জলি ধ্যুৎ............

মঞ্জুলি! বললে মলি।

হ্যাঁ হ্যাঁ মঞ্জুলি। মনে পড়ে আমাদের সাথে যূথির কাছে জুন-

পুটে একবার বেড়াতে গিয়ে সে সমুদ্রতীরে ঢেউ খেলানো বালুর উপর তার চাঁপাফুলের মতো আঙুল দিয়ে কতগুলি সুন্দর দৃশ্য, কিছু হিজি-বিজি, কিছু লতাপাতা ফুল এঁকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো সেগুলির দিকে? আমরাও মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। সত্যি ভালো এঁকে-ছিলো!

আমি বলেছিলাম—বাঃ বাঃ সুন্দর এঁকেছিস তো মঞ্জুলি। ঢেউ খেলানো বালুর মাঝেও তুই সুন্দর রূপ ফোঁটাতে পারিস। তুইও রূপসী তোর বালুরেখাগুলিও রূপসী।

কিন্তু তার পরেই হাল্‌কা একটু ঘূর্ণিঝড়ের মতো উঠলো এবং এসে গেলো একটা বড় ঢেউ আর ওই সুন্দর রূপসী বালুরেখাগুলি মিলিয়ে গেলো, মুছে একাকার হয়ে গেলো।

আমাদের সে কি ভীষণ আপসোস্‌। কিন্তু মঞ্জুলি আপন মনেই বলেছিলো—এটাই বর্তমান সময়ের ও বর্তমান সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম। এখনতো সবই অস্থির এবং ক্ষনস্থায়ী। এই এক চিন্তা, পর মুহূর্তেই অন্য চিন্তা। এই মিল, মুহূর্তেই গরমিল। এই জীবনের একধারা, সামান্য পরেই অন্যধারা। এই আকর্ষণ, এই বিকর্ষণ।

হ্যাঁ মনে পড়ে—মলি বললে।

জানিস, মঞ্জুলির মতো আমারও এখন মনে হয়, আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের জীবনটা সমাজটা আর চিন্তাধারাটাও রূপসী বালুরেখার মতোই অস্থির এবং ক্ষণস্থায়ী।

প্রেম বলো, ভালবাসা বলো, সেক্স বলো, ব্যবসা বলো, ভ্রাতৃস্নেহ বলো, স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা বলো, শ্রমিক মালিক সম্পর্ক বলো, উচ্চ আশা বলো, সবই ওই মঞ্জুলির আঁকা রূপসী-বালুরেখার মতো—পদ্মপাতার জলের মতো। বালুরেখার মতোই অচিরে বুজে যায়, মুছে যায়, ক্ষয়ে যায়। পদ্মপাতার জলের মতোই টল্‌মল্‌ করে পড়ে যায়, নড়ে যায়, ঝরে যায়।

ভালোবাসাও ব্যবসার উপমায় মলি হঠাৎ চম্‌কে উঠেই সামলে

নেয়।

মলি ভাবছিলো ওদের অর্থাৎ রূপক আর মলিরও আবার এমনিই হবেনাতো, রূপসী বালুরেখার মতো, পদ্মপাতার জলের মতো!

কিন্তু মুখে বললো—যা বলেছিস। কথাগুলি হয়তো কিছুটা সত্যিও। তবে সবটাই কি সত্যি?

এদিকে অনেকটা ঘুরে ফিরে সোমেশ ও রূপক ফিরে এলো।

রূপক বললে:—কি গল্প হলো?

হ্যাঁ হলো। উত্তর দিলো শেলী।

চলুন তবে এবার ওঠা যাক। আবার বললো রূপক।

হ্যাঁ চলুন, বললে শেলী। আমাদের হোটেলে একদিন আসুন না রূপকবাবু মলিকে নিয়ে। খুব খুশি হবো।

সোমেশও বললে—হ্যাঁ সত্যি, একদিন আসুন সময় করে। আমরাতো আরও পাঁচদিন আছি।

কিন্তু আমরা যে কালই চলে যাচ্ছি। ও আর থাকতে চাচ্ছে না। অফিসের অসুবিধা হচ্ছে নাকি! এবার উত্তর দিলো মলি।

তাই নাকি রূপক বাবু? বললে শেলী।

রূপক মাথা নেড়ে জবাব দিলো।

তাহ'লে আর কি হবে। কলকাতায় গিয়েই দেখা হবে'খন—এবার বললে সোমেশ।

তারপর পরস্পর বর্তমান ঠিকানা লিখে নিলো।

হঠাৎ পার্কের আলোগুলো জ্বলে উঠ্ছে। আলোর আভায় পার্কের ফুলগুলি গাছগুলি, ঝল্মল্ করছে। ঝোপের পাশগুলিতে আলোর ছায়া পড়ায় সেইখানটায় আলো আঁধারির ছোঁয়া লেগেছে। হাল্কা হিমেল হাওয়া বইছে শির্ শির্ করে। বসে বসে সময় কাটানোরও গল্প বলার ছেলেমেয়ে ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার সংখ্যা এতক্ষণে আরও বেড়েছে।

মলিরা কিছুটা সময় পাশাপাশি কথা বলতে বলতে মোড়ে এসে

নমস্কার বিনিময় করে যে যার পথে রওনা দিলো ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।

বিদায়ের প্রাক্কালে মলি ও শেলীর ধরা গলা ও ছলছল্ চোখের টল্‌মল্ জল এই আবছা আঁধারেও সোমেশ ও রূপকের চোখ এড়ায় নি।

বিদায় নিতে গিয়ে তাদেরও গলার স্বরটা একটু ভারী হয়ে এলো স্বাভাবিক কারনেই।

ঠিক রাত আটটায় মলি ও রূপক ফিরে এলো হাউজ বোটে! জামা-কাপড় ছাড়তে যার যার কামরায় ঢুকে গেলো তারা। রূপক চট্‌জলদি জামা ছেড়ে সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখলো লাইটার নেই। লাইটার ছিলো মলির ব্যাগে। মলি পার্কে রূপক ও সোমেশকে সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে আনমনে তার ব্যাগেই রেখে দিয়েছিলো লাইটারটা।

রূপকের হঠাৎ মনে পড়ে গেলো সেকথা। সে তখনই মলির ঘরের দিকে পা বাড়ালো। হটাৎ একটা দুষ্ট বুদ্ধিও তার মাথায় চেপে গেলো। সে চট্ করে দরজা খুলে মলির ঘরে ঢুকে গেলো।

এই, এই, কি হচ্ছে, মলি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি দু'হাত আড়াআড়ি করে বুকটা ঢেকে নিলো।

তখনও তার জামাকাপড় ছাড়া হয় নি। সবে শাড়ি ও ব্লাউজটা খুলেছে।

লাইটারটা নিতে এলাম তো।

আর সময় পেলে না লাইটার নেবার! মলি একটা তির্যক দৃষ্টি হানলো রূপকের দিকে। দেখতে পাচ্ছো না, কি অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। শীগগীর বের হও।

না।

যাবে কিনা শুনতে চাই?

না না, রূপকের চোখে দুষ্টুমি।

তুমি ভীষণ অসভ্য হয়ে গেছো কিন্তু।

দেখতে কিন্তু বেশ লাগছে। শায়ার নিচের লেসের নক্শাটাতো ভারি সুন্দর। কাছে গিয়ে ভালো করে দেখবো নাকি ?"

ও মা ! বলে মলি এক লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে গেলো।

রূপক এগোচ্ছিলো। হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালো।

এই শাড়ি পরতে দেবে, না এসব নমুনা করা হবে। সব কিছু ছেড়েটেড়ে গরম জলে হালকাভাবে গা'টা একটু স্পঞ্জ করে নেবো ভাবছি। খিদেও লেগেছে কিন্তু বড্ড।

তুমি পর না।

আ হা হা, তুমি পর না। তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে আমি ব্রা খুলি কি ভাবে ?

এই আমি চোখ বুজলাম।

তোমাকে আর বিশ্বাস নেই। তুমি ঘুরে দাঁড়াও।

দাঁড়ালাম।

চোখ বুজো।

বুজলাম।

ঠিক বুজেছো তো।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

খুলবে না কিন্তু একদম। ফিরবেও না। আমি যখন বলবো তখন চোখ খুলবে এবং ফিরবে।

তাই সই।

মলি বিছানা থেকে নেমে রূপকের পাশ দিয়ে গেলো। একটা শাড়ি নিলো বাঁহাত দিয়ে শাড়ির থাক হ'তে। রূপক আড়চোখে একবার তাকালো। মলি দেখতে পেলো না। সে তখন নিজের কথাই ভাবছে। দেহটাকে ঢাকতেই সে ব্যস্ত।

মলি ভাবছে, পুরুষের মন, কখন কি করে বসবে তার ঠিক নেই। রূপক যদি জড়িয়ে ধরেই ফেলে তবে ছাড়ানো হয়তো মুসকিল হয়ে যাবে। তাই সে খুব তাড়াতাড়ি করছে।

তোমার গায়ের সেন্টের গন্ধ কিন্তু পেলাম। রূপক বললো।

এই রে, মলি চম্‌কে উঠলো। মুখে বললো, পেয়েছো তো পেয়েছো। বেশ হয়েছে। ওই নিয়েই থাকো আরো কিছুক্ষণ।

তোমার গায়ের গন্ধও পেতে ইচ্ছে করে।

এসো না কাছে, এক ঘুষিতে মনের খুশি উড়িয়ে দেবো। এবং বলেই মলি ফিক্ করে হেসে ফেললো।

আর রূপক ও চোখ খুলে ফেললো, ফিরলো। মলির ব্রা ততক্ষণে খোলা হয়ে গেছে। ফ্রেস শাড়ি সবে পারবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই ফিরলো রূপক। ঘুরে গেলো মলিও এক লহমায়।

রূপকের সামনে পৃথিবী তুল্‌ছে।

আরক্তিম হয়ে গেলো মলির সারা অঙ্গ একরাশ আবির ছড়ানো লজ্জায়। আর রূপক দেখলো, জল স্থল আকাশের সমস্ত সৌন্দর্য উজাড় করে দেওয়া প্রায় সম্পূর্ণ নিরাবরণ নারী দেহের সুরভিত যৌবনের এক বিস্ময়কর বিদ্যুৎ-ঝিলিক্।

মুহূর্তে মলি শাড়িতে ঢেকে ফেললো সারা অঙ্গ।

রূপক চলে এলো চট্ করে দরজাটা খুলে।

অনেকক্ষণ পর ওরা রাতের খাবার খেয়ে যার যার ঘরে শুয়ে পড়লো।

বিছানায় শুয়ে মলি ভাবলো, কি লজ্জা! আমার নারী দেহের প্রায় কিছুই আর ঢাকা চাপা রইলো না রূপকের কাছে। মনে মনে হাসলও মলি। খুশির হাসি। রামধনু রঙের হাসি।

আর বিছানায় শুয়ে রূপকও ভাবলো, কবি কীট্‌স বলেছিলো, সৌন্দর্যের এক কণাও চিরদিনের জন্য সুন্দর। সেতো আজ শুধু এক কণাই দেখেনি। দেখেছে হাজার হাজার কণা মলির সারা দেহে সলমা জরির মতো চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করছে। সৌন্দর্যের লক্ষ লক্ষ ঢেউ মলির দেহের ভাঁজে ভাঁজে দোলায়িত হচ্ছে। সেকি অপরূপ রূপ-লহরী!

ঘুম আসছে না রূপকের। একটা ঝিমুনি ঝিমুনি ভাব শুধু। সন্ধ্যার দৃশ্যগুলি সে ভেবেই চল্‌ছে। এই ভাবনার সাথে এসে যোগ হলো কেলাংগুয়েট সী বীচে মলিকে কষ্টিউম পরিয়ে হিপনী সাজায়ে জলে নামানোর ইচ্ছাটা ও ভাবনাটা। এ অনেকটা অবচেতন মনের সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট বা স্বপ্নদর্শনও হতে পারে—যা হয়তো মানুষের মনে ঝিমুনি, তন্দ্রাচ্ছন্ন বা ঘুমন্ত অবস্থায় প্রতিফলিত হয়।

সে অবস্থায়ই রূপক ভেবে চললো, কল্পনা করে চললো, এবং দেখলো……মলি যেন তাকে ডেকে বলছে, কালতো চলেই যাব, চলোনা দুজনায় স্বপ্নে ভেসে ভেসে আরব সাগরের নীল জলে জলকেলি করে আসি। চল যাই সেই কেলাংগুয়েট সী বীচে।

সুইমিং কষ্টিউম পরে না কি? বলছে রূপক।

না না, এমনি এমনি। তুমিতো কেলাংগুয়েট বীচে বলেছিলে, কষ্টিউম পরে হিপি হিপিণীদের মতো চান করতে। তোমার ওই সখটা না হয় আজ যাবার আগে মিটিয়ে দিলাম কিছুটা। তখন তো লজ্জায় রাজী হই নি।

এখন লজ্জা নেই? বললো রূপক।

অনেকটা কেটে গেছে। তুমি একখানা যা না। বা ব্বাঃ। তবে কষ্টিউম পরে কিন্তু নয়। স্রেফ্ শাড়ি পরে।

তবে গা'য়ে সরষের তেল মেখে নিতে হবে দুশো গ্রাম। রূপক বললো।

কেন?

নিমোনিয়া হবে না হলে।

তাই নেবো। তুমিও মাখবে তো?

মাখতেই হবে। এতো তাড়াতাড়ি নিমোনিয়া ডেকে এনে মলি সুন্দরীর স্বর্গ হ'তে কে আর বিদায় নিতে চায়। একটু আগের লাইটার নেবার সিন্‌টা মনে আছে তো মলি?

যাও। আজকাল কিন্তু ভীষণ দুষ্টু হয়ে গেছো।

তুমিও কম যাও না।

কি রকম। মলির কৃত্রিম রাগ। আমি কি করলাম। আমি কি তোমার মতো কাপড় ছাড়ার সময় ঘরে ঢুকি নাকি? ছিঁচ্‌কে অসভ্য নাকি। মলি মুচকি হাসলো এবার।

না, বেশ বড়সড় অসভ্য।

কি বললে? আবার সামান্য রাগ।

বললাম বেশ বড় সভ্য, অর্থাৎ মেম্বার।

উভয়েই হেসে উঠলো এবার।

তারপর—রূপক ও মলি জলে নামলো। মলির আটপৌড়ে শাড়ি। হাঁটু পর্যন্ত। কোনরকমে দেহটা ঢাকা। রূপকের শুধু টার্কিশ টাওয়েল জড়ানো।

দুজনে কিছুক্ষণ এলোমেলো সাঁতার কাটলো আরব সাগরের জলে।

এদিকটা বেশ নিরিবিলি।

কিছুদূরে অনেক লোক চান করছে। কেউ কষ্টিউম পরে, কেউ অন্যকিছু। তবে সবাই যারযার তালে আছে।

খুব খুশি রূপক মলি দু'জনেই। এ ওর গায়ে জল দিচ্ছে, ও এর গায়ে জল ছিটাচ্ছে। কেউ টুপ্‌ করে ডুব দিচ্ছে। কেউ দিচ্ছে ডুব-সাঁতার। বালিতে আবার গড়াগড়ি করলো দু'জনে কিছুক্ষণ। আবার জলে নামলো তারা। সাগরের ঢেউ নিলো। মলি একবার হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়লো রূপকের গায়ে একটা বড় ঢেউয়ের তোড়ে। জড়াজড়ি হয়ে গেলো দু'জনের কিছুক্ষণ।

এরূপ করতে করতে এক সময় দু'জনার মনেই সাগরের ঢেউয়ের দোলা লেগে গেলো।

এক সময় রূপক বললে, এই মলি এদিকে এসো।

না বাবা, তোমার কাছে যাবো না।

কেন?

দেখছোনা শাড়ি কতো ছোট। সারা গায়ে ধরছে না। মলি শাড়ি ঠিক করতে চেষ্টা করলো।

শাড়ি ছোটতো কি হয়েছে, এসো।

না।

তবে আমিই যাচ্ছি, বলে রূপক মলির দিকে সাঁতার দিলো। মলিও কিছুটা হেঁটে কিছুটা সাঁতরে পালাতে লাগলো। কিন্তু পারবে কেন রূপকের সাথে। মলি ডুব দিলো। রূপকও ডুব দিলো। আবার দু'জনেই ভেসে উঠলো। কাছে রূপককে দেখেই মলি তাড়াতাড়ি আবার ডুব দিলো। রূপকও ডুব দিয়ে জলের নিচেই মলিকে প্রায় ধরে ফেললো। অগত্যা মলি ভেসে উঠলো। ভাসলো রূপকও।

মলি বললে, কি হচ্ছে—এই সাধু পুরুষ, হচ্ছেটা কি?

বেশ ভাল লাগছে কিন্তু। কাছে এসোনা একটু, প্লিজ।

রূপক হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলো। মলি চট করে ডুব মেরে দিলো। রূপক দেখছে কোথায় ভেসে উঠে। কিন্তু মলি এক জায়গায়ই ডুব দিয়ে চুপ করে ছিলো। ভেবেছিলো রূপক অন্যখানে সাঁতরে চলে যাবে খুঁজতে। কিন্তু ভেসে উঠেই মলি দেখলো, একদম মুখোমুখি রূপক।

তবে রে—বলেই রূপক মলিকে ধরতে চাইলো। মলিও পালাতে চাইলো। কিন্তু রূপক মলির শাড়ির আঁচল ধরে ফেললো। শাড়ি এমনিতেই অনেকটা আলগা।

মলি ফিস্ ফিস্ করে বললো, এই ছাড়ো, আঁচল ছাড়ো রূপক, দেখছোনা শরীরের কি অবস্থা। সারাদেহের শাড়িই জলে ভাসছে যে।

রূপক এক ঝলক দেখলো। দেখলো মলির ভাসন্ত দেহের জলছবি সাগরের জলে। জলে ভেজা পিচ্ছিল সৌন্দর্যের মাদকতাই আলাদা। উন্মন হ'লো রূপকের মন। তার চোখে মুখে আবেশ। মলির চুলগুলিও ভাসছিলো জলে। রূপক মুঠি করে ভাসন্ত চুলগুলি

ধরলো। সুগন্ধ তেলের সৌরভে ভরা চুল। মলির পিঠে হাত দিয়ে তাকে আকর্ষণ করলো কাছে।

আবেশে বিহ্বল মলিও। বাধা দিলোনা। দু'জনেই দু'জনের চোখের দিকে তাকালো। ভাললাগা ভালবাসা কিছুটা কামনার রঙ্ পেলো। পেলো যেন কিছুটা সঙ্গ সুখের ছোয়া।

প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম নয় সাধারণ মানুষ। নয় রক্তে মাংসে গড়া মলি ও রূপক। তাই দু'জনার বুক দু'জনার দেহের চাপে মিলে গেলো। দু'জনার হাতের অঙ্গুলি দু'জনার দেহেই স্বপ্নিল হয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়ালো। মলি উষ্ণ চুম্বনে সঙ্গ সুখের আরতি জানালো। রূপকও তন্ময় হয়ে, এক মুঠো সোনালী স্বপ্নের মতো চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিলো মলির চুল গাল বাহু পৃষ্ঠদেশ ও গ্রীবা।·········

হাউস বোটে কিসের একটা আওয়াজে হঠাৎ রূপকের ভাবনার জাল, কল্পনার জাল, দেখার জাল ছিঁড়ে গেলো।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো রূপক। চোখে মুখে উষ্ণ গরম জলের ঝাপটা দিলো কয়েকবার। তারপর গা এলিয়ে দিলো আবার বিছানায়।

মলির ডাকে রূপকের ঘুম ভাঙ্লো পরদিন ঠিক ছয়টায়।

এইভাবে আনন্দ উচ্ছাস ও বন্ধু বান্ধবীর সাহচর্যে কয়েকটা দিন কাটিয়ে, আরও কিছু নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে, চাপা হাসিতে, নানান্ টুকরো টুকরো কথার মাধ্যমে, নিজেরা আরও কাছাকাছি আরও পাশাপাশি এসে, কলকাতায় ফিরে এলো মলি ও রূপক।

দশ

রূপকের কাশ্মীর যাওয়ার দুদিন আগে একটি ঘটনা ঘটে। ঘটনাটির কথা মলি জানে না। ঘটনাটি এই রকম—

সাধুবাবার আশ্রমে কালিঙ্গা এসে আর একদিন বললে—আজ হবে সাধুজী?

সাধু বললে—হবে। তবে জোর করে কোন মেয়েকে ধর্ষণ করতে চাইলেই বিপদ। সাধু বিড়্ বিড়্ করে বললো শেষের কথাগুলি।

ধর্ষণের কথাটা শুনে কালিঙ্গা আধ হাত জিভ বের করে মাথা নেড়ে চলে যায়। একটু গিয়েই কি ভেবে যেনো ফিরে আসে। সাধুকে ঘরের ভেতর চলে যেতে দেখে আবার চলে যায়।

পরের দিন কালিঙ্গা এসে সাধুকে একটা লম্বাগড় করে বললো—আজ আমার আস্তানায় যেতে হবে আপনাকে। আমাকে আপনি যে দিন যা বলেছেন সবই অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। আমি আপনার কাছ থেকে তিনটে টিপ নিয়েছি। তিনটাই রাইট। সুতরাং কিছুতেই আপনাকে না নিয়ে যাচ্ছিনা সাধুবাবা।

সাধুজী বললো—আমি কুটিরবাসী সন্ন্যাসী, কুটির ছেড়েতো কোথাও যেতে চাইনা বেটা।

সে সব হবে না সাধুজী। আজ যেতে হবে। আজ কিছুতেই ছাড়ছিনা আপনাকে—বললে কালিঙ্গা। আর যদি না যান তবে—একটু থেমে কোমর হতে একটা বড় ছুরি বের করে নিজেই নিজের বুকে ঠেকিয়ে বললো—নিজের জান নিজেই খতম করে দেবো। এই আশ্রমের মাটি আমার বুকের রক্তে লাল হয়ে যাবে। সাধু তাড়াতাড়ি—থাম্ বেটা থাম্, করিস কি করিস কি, বলে যাবার কথা দিলে কালিঙ্গা নিরস্ত্র হলো।

হায়! চিরদিনই ভক্তের অধীনে কিছুনা ভেবেই ভগবানেরা রয়ে গেলেন?

আর এদিকে ঘুরতে ঘুরতে সাধারণ জামাকাপড় পরা রূপকও সেখানে এসে হাজির হলো তখন। রূপক সাধুবাবার ও কালিঙ্গার কথপোকথন শুনতে পায়নি একটুও। রূপককে দেখেই সাধুবাবা বললেন—দেখ বেটা দেখ এই পাগলার কাণ্ড! বলে কিনা আমাকে নিয়ে যাবে কোথায় নাকি ওর কোন আস্তানা আছে সেখানটায়। আমি কি কোথাও যাই আমার আশ্রম ছেড়ে?

তারপর সাধু আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কি যেনো ভাবলেন। বিড়্‌বিড়্‌ করে কি সব বললেন এবং পরে হঠাৎই বলে উঠলেন—চল্‌ বেটা তুইও চল্‌।

কালিঙ্গা রূপককে চেনেও না দেখেওনি কোনদিন। কালিঙ্গা কি যেন ভাবছে।

সাধুজী সঙ্গে সঙ্গে বললেন—মনে মনে কি ভাবছিস্‌ বেটা। তুই যদি আমার এক বেটা তবে ওভি আমার আরেক সাচ্চা বেটা। চল্‌ চল্‌।

সাধুজীর কথায় কালিঙ্গা আশ্বস্ত হলো। ভাবলো এই ভদ্রলোকও হয়তো ঘোড়া টোড়ার কোন টিপ্‌ টোপ নেয় এখান হ'তে।

তাই অচিরে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনলো কালিঙ্গা। তারপর ট্যাক্সিতে চেপে বসলো তিনজনেই।

ট্যাক্সি নানা রাস্তা ঘুরে—কারণ সি. এম. ডি. এর কল্যাণে প্রায় রাস্তাই খোঁড়াখুঁড়ি চলছে কিনা—অবশেষে গড়ের মাঠের রাস্তা দিয়ে খিদিরপুরের ব্রীজ পার হয়ে ডানদিকে ঘুরে ওয়াটগঞ্জের দিকে ঢুকলো। তারপর আরও বেশ কিছুক্ষণ চলে গাড়ি থামলো।

একসময় তারা নামল ট্যাক্সি হ'তে। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আশেপাশে বাজে নোংরা লোক গিজগিজ করছে।

কালিঙ্গার দিকে তাকিয়ে লোকগুলির কেউ বলছে—সেলাম সাব সেলাম সাব, কেউ বলছে—সেলাম সর্দার, আবার কেউবা বলছে—সেলাম ওস্তাদজী। সাধুজী ও রূপক শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। তারা বুঝতে পারছেনা ব্যাপারটা কি। কালিঙ্গা লোকটা আসলে কে?

রূপক দেখতে পায়নি, কিন্তু সাধুজীর ভ্রূযুগল হঠাৎ কুঁচকে গিয়েই স্থির হয়ে গেলো।

……তারপর একটা গলি পার হয়ে কলিঙ্গা একটা বাগান বাড়ীর সামনে এলো।

'ওস্তাদজী সেলাম'—বলে দারোয়ান গেট খুলে দিলো। তিন-জনেই ভিতরে ঢুকলো। সামনে বেশ সুন্দর রঙ-বে-রঙের ফুলের বাগান। সুন্দর বাগান। বাগানে একজন মালী কাজও করছে। বাগানে নানা রঙের সিজন ফ্লাওয়ার হাস্নুহানা, যুঁই, রজনীগন্ধা, সূর্য-মুখী ইত্যাদি ফুলের গাছ আছে এবং অনেক গাছে ফুলও ফোটে আছে। ফুলের মিষ্টি গন্ধে জায়গাটা ম ম করছে।

এরূপ নোংরা বস্তির কিছুদুরেই পুরানো হলেও এমন সুন্দর বাগানবাড়ী যে থাকতে পারে কেউ চোখে না দেখলে তা বিশ্বাসই করবে না। লোকে জানে বাড়ীটার মালিক জনৈক করঞ্জিয়া। হালে বাড়িটার কিছু মেরামত করা হয়েছে।

বাগান পার হয়ে কালিঞ্জা বাগানের একটা দেওয়ালে লাগানো খিরকী দরজার সামনে গেলো এবং দেওয়ালের কোনের একটা বোতাম টিপলো।

শব্দ করে দেওয়ালের একটা অংশ সরে গেলো। দেখা গেলো সিঁড়ি। সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। কালিঞ্জা রূপক ও সাধুজীকে নিচে নামতে বললো।

রূপক ইতস্ততঃ করছে দেখে কালিঞ্জা বাংলা ও ভাঙ্গা হিন্দি মিশিয়ে বলতে লাগলো—কারণ এখানের পরিবেশে এসেই কালিঞ্জার মস্তানী ঢং এসে গেছে, এবং হিন্দীতেই মনে হয় মস্তানী কথাগুলি ভালো শোনায়—ভয় নেই বাবুজী, এসবকুছই হাম্হারা হ্যায়। হাম্হারা এক্তিয়ার মে হ্যায়। আউর হামারাছে জেদা ওস্তাদ হিয়া কৈ ভি নেহি হ্যায়। ম্যাৎ ডরিয়ে। কোছ্ ভয় নেই। আপ দুনো লোগ্ আজ হামারা মেহমান।

রূপক ও সাধুজী সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলো। দেখলো কিছু লোক। কয়েকটা ছোট ঘর। সবই আণ্ডার গ্রাউণ্ডে।

আণ্ডার গ্রাউণ্ডের উপরে কিন্তু আছে ভাঙ্গচোরা একটা গো-ডাউন। এখানেও কাজ করে কিছু লোক। এই গোডাউনের প্রবেশ

পথ কিন্তু গঙ্গার পাড়ের দিকের রাস্তা দিয়ে। দেখে মনে হবে নিচের আণ্ডার গ্রাউণ্ডের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আছে।

কলিঙ্গাকে দেখে লোকগুলি বললে—ওস্তাদ আগিয়া, ওস্তাদ আগিয়া।

এবার কালিঙ্গা সাধুজীর দিকে তাকিয়ে ভাঙ্গা বাংলায় বললো—আপনি সাধু মানুষ আছেন। আপনাকে এখানে এনে এসব দেখানোর জন্য আমার কসুর মাপ করবেন। কিন্তু আপনাকে আমি না দেখিয়ে পারিনি, না দেখিয়ে মনে কিছুতেই শান্তি পাই নি।

সাধুজী তাকালো এবার, কিন্তু সাধুর চোখ-মুখের ভাব দেখে কিছুই বোঝা গেল না।

সাধুজী ও রূপক দেখলো, কেউ কেউ খেলছে জুয়া, কেউ খেলছে ফ্লাস, কেউ গিল্‌ছে মদ। কেউ বাক্স ভর্তি করছে কি সব জিনিস পত্র দিয়ে।পেরেক ঠুকে আবার আট্‌কিয়ে ও দিচ্ছে। কেউ কার্ড বোর্ডের প্যাকিং ভাংছে। কেউ প্যাকিং করছে। কতো ধরণের যে প্যাকিং বাক্স, কাঠের বাক্স, পলিথিনের বাক্স, পিজবোর্ডের বাক্স, তার ইয়ত্যা নেই।

আর দেখলো কাচের বড় বড় জার ভর্তি কিসব তরল পদার্থ। আর এক জায়গায় দেখলো একটা যৌবন ঠাসা কালো মেয়ে বিশ্রী অঙ্গ ভঙ্গি করে নাচ্‌ছে আর গান গাইছে। আশে পাশের সবাই বাহবা দিচ্ছে।

এবার রূপক নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলো কালিঙ্গা চোরা চালান-দার অথবা টপ্‌ কোন চোরা চালানদারের টপ্‌ বাহক।

আস্তানায় আসার আগেই হয়তো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সাধুজী কিছুটা বুঝেছিলো—এবার চোখে দেখে বেশ অখুশি হলো।

খুশি হলো না রূপকও। হবার কথাও নয়। তবে মুখে তারা কেহ কিছু বললো না।

সব কিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে কালিঙ্গা অন্য একটি সুরঙ্গ পথ

দিয়ে দু'জনকে উপরে নিয়ে এলো।

রূপকও সাধুজী দেখলো তারা গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুড়ঙ্গ পথটি গঙ্গার পাড়ে এসেই শেষ হয়ে গেছে তা তারা দু'জনেই বুঝলো।

কালিঞ্জা একটি ট্যাক্সি ডেকে তাতে রূপক ও সাধুজীকে তুলে দিয়ে ড্রাইভারকে হুকুম করলো—পৌঁছা দো বরানগর মে।

আর সাধুজীকে বললো আপ্‌কো বহুৎ মেহেরবান। ফের একটি টিপ্‌ নেবার জন্য দু'চার দিন বাদে আবার যাবো। আর এই দুশোটা টাকা দেব্‌তাকা পূজা ও সিন্নির জন্য আপনাকে নিতে হবে।

বলেই হঠাৎ প্রায় জোর করেই গুঁজে দিলো টাকাটা সাধুবাবার হাতে। সাধুজী প্রতিবাদ করার আগেই গাড়ী ছুটে চললো তীর বেগে।

চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী—প্রবাদটি সত্য না মিথ্যা?

সাধুজী তাড়াতাড়ি ড্রাইভারকে বললো—আমাদের পৌঁছে দিয়ে এই দুশোটাকা তুমিই নিয়ে নেবে। আমি সাধু মানুষ। অত টাকা নিয়ে আমি কি করবো?

ড্রাইভার ভয়ে আঁৎকে উঠে বললো—না সাধুজী, আমি এক পয়সাও নিতে পারবো না। ওস্তাদজী তবে আমার মাথার খুলি এক গুলিতে উড়িয়ে দেবে।

ওস্তাদ? কোন্‌ ওস্তাদ? এতক্ষণে রূপক কথা বললো এই ওস্তাদের কিছুটা হদিশ নেবার জন্য।

ড্রাইভার বলল—এই কালিঞ্জা ওস্তাদ।

এর নাম কালিঞ্জা? একে তুমি চেনো?

কে না চেনে এ তল্লাটে, তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে গলার স্বর নিচু করে বললে—একটা ভারী দলের সর্দার।

তারপর সহজ গলায় বললে, বহুৎ টাকার মালিক। গঙ্গার পাড়েই আছে তার গোডাউন।

তুমি ভাড়া নেবে না আমাদের কাছ থেকে ?

না। ভাড়া কালিঞ্জা সর্দার দেবে। তবে আমি বলছি এ পাপ লাইন আমি ছেড়ে দেবো। ডাকুদের সাথে আর সামিল হব না। ঘেন্না ধরে গেছে, আমার এই কয় মাসেই। ওরা গুরুজী কী ফতে।

উভয়ের কথাবার্তা শুনে এবার সাধুজী আশ্রমে পৌঁছে ড্রাইভারকে অনেক অনুনয় বিনয় ও পীড়াপীড়ি করায় এবং আবারও কথা দেওয়ায় যে কালিঞ্জা ওস্তাদকে তারা এ টাকার কথা কখনও বলবে না, তবেই টাকাটা ড্রাইভার নিলো এবং লম্বা সেলাম ঠুকে গাড়ী নিয়ে চলে গেলো।

ভয়ের চেয়েও লোভ অনেক অনেক বেশী শক্তিশালী।

সাধুজী ও রূপক আবছা আঁধারে গাড়ী হতে নেমে নিঃশব্দে চলে গেলো কুটির প্রাঙ্গনে। কেউ তাদের লক্ষ্য করলো না।

আর এই রাতেই কথায় কথায় সাধুবাবা জেনে নিলো রূপকের সব পরিচয়, নাম ধাম সব ইতিহাস। মায় সাধুজীর চলে আসার পর জন্ম নেওয়া রূপকের ছোটবোন মেঘনায় গ্রাস করা অভিষিকার কথাও।

সাধুজী বুঝলেন রূপকই তার বড়দা হেমন্তদার একমাত্র পুত্র। সুদূর অতীতের সেই ছোট্ট ছেলেটি। কিন্তু সংসার বিবাগী সাধু রূপককে মুখে কিছুই বললেন না। আর রূপকও বুঝতে পারলো না যে এই সাধুই ছোট বেলাকার সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া তার সেই কাকা। অনন্তকাকা।

১১

মলি ও রূপক কোলকাতায় এসেই শুনতে পেলো গত রাত্রেই ডকে জাহাজে মাল বোঝাই করতে যাওয়ার পথে দুই লরি মাল—খুব দামীদামী মাল—পিস্তল উঁচিয়ে ড্রাইভারদের ছোরা ও ভোজালী মেরে কারা লুট করে নিয়ে গেছে।

ম্যানেজার অম্বরবাবু ব্যাপারটা পুলিশকে রিপোর্ট করে রেখেছে। ধীরেনবাবু মানা করায় রূপক ও মলিকে ট্রাঙ্কল করা হয়নি কাশ্মীরে।

খবর শুনে মলি ও রূপক উভয়েই আশ্চর্য হলো এবং চিন্তিতও হলো।

রূপক চিন্তিত হলো আরও বেশী। সে মনে মনে ভাবলো—নিজের পায়ে-দাঁড়াবার জন্য সে কি না করেছে। প্রথমে লরী ক্লিনার দিয়ে শুরু। পরে রিক্‌শা টানা, তারপরে সাধুবাবার মাদুলী, ভাগ্যের বা লটারীর টাকা ও আরও পরে প্রচুর পরিশ্রম করে গড়ে তোলা এই কারখানা।

রূপক যেন কেমন দমে যায়। তার পরেই হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বলে—না না! আধুনিক সমাজের সৃষ্টি এই দুষ্ট সামাজিক কিট-গুলিকেই শায়েস্তা করা দরকার। দু'হাত দিয়ে জীবনের পাঞ্জা কষেও এই কীটগুলির জ্বালায় জীবনকে সুন্দর করার কোন পরিকল্পনাকে সার্থক রূপ দেওয়া দুষ্কর। কিন্তু দমে গেলে চলবে না। এগিয়ে যেতেই হবে আমাকে সুন্দর সুস্থ রঙীন একটা আশার আকাশের দিকে।

রূপক আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। সে শুধু পুলিশের ভরসাতেই রইলো না। ম্যানেজারের সাথে পরামর্শ করে মাল কারা লুট করেছে তার হদিস নেবার জন্য দু'জন নামকরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ মকবুল ও সত্যেশবাবুকে লাগিয়ে দিলো মোটা টাকা হাতে দিয়ে।

তারা তন্ন তন্ন করে মস্তানদের আড্ডাগুলি খুঁজে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

রূপকও পুলিশের বড় কর্তাকে ফোন করে ব্যাপারটার বিশদ খোঁজ খবর নিলো।

পুলিশ কমিশনার উত্তরে বললেন—তারা এই ব্যাপারটার কিনারা করতে প্রচুর সাদা পোষাকের পুলিশ নামিয়েছেন। খুব শিগগির

হয়তো পুরো দলটা ধরা পড়বে। কারণ এ অঞ্চলটায় ইদানিং লুটপাট খুব বেশী হচ্ছে। এ ব্যাপারে পুলিশ মহলও খুব চিন্তিত।

কোলকাতায় এসে রূপক ম্যানেজারবাবুর কাছে আরও একটা নতুন খবর শুনেছিলো—গোবিন্দ ও গোলাপী কয়দিনের ছুটি নিয়ে সেই যে গেছে আর আসছে না। উভয়েই রিজাইন লেটার পাঠিয়ে দিয়েছে। ওরা নাকি গেরুয়াধারী সাধু হয়ে গেছে। গোবিন্দর দেশে পুরীর পাশেই নাকি কোথায় দু'জনে ডেরা বেঁধেছে।

কথাশুনে রূপক অনেক দুঃখের মাঝেও একটু হেসেছিলো মাত্র।

যৌবনের উচ্ছল প্রাণমাতানো প্রেমের কি শান্ত স্নিগ্ধ বৈপরীত্য! একি বর্তমান যুগের স্থিরতা না অস্থিরতার সূচক?

১২

এদিকে কারখানার মাল লুটের ঝামেলায় চিন্তিত মলি একদিন সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলো। একা। হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। সে কখন যে আউট্রাম ঘাটের নির্জন রাস্তায় এসে পড়েছে তার খেয়ালই ছিলানা।

দূর হতে একজন লোক কিন্তু তাকে বরাবরই ফলো করছিলো। কখনও গাড়ি চালিয়ে কখনও হেঁটে।

সময় এবং সুযোগ মত জায়গায় মলি আসা মাত্রই সে দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়ে হঠাৎ মলির নিকট এসে ব্রেক কষে লাফিয়ে নেমে সবল হাতে মলির মুখে হাত চাপা দিলো।

মলি অস্পষ্ট চিৎকার করল একবার। হাতপা ছুঁড়ে বাধা দিতে চেষ্টা করলো ভীষণ ভাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আগন্তুক মলির মস্তকে পিস্তলের বাট দিয়ে আঘাত করলো। মলি হত চেতন হয়ে পড়ে যেতেই আগন্তুক তাকে গাড়ীতে তুলে গাড়ি চালিয়ে দিলো তীব্র বেগে।

এই আগন্তুকের নাম কালিঙ্গা সর্দার।

গাড়ী একটু পরেই গঙ্গার ধারে কালিঞ্জার আড্ডায় ঢোকার সুড়ঙ্গ মুখ হতে কিছু দূরে একটি গাড়ি গ্যারেজে এসে দাঁড়ালো। তারপর কালিঞ্জা অচেতন মলিকে কাঁধে করে সুড়ঙ্গের দিকে এগোল এবং একটা গুপ্ত সুইচ টিপে সুড়ঙ্গের মুখ খুলে ভেতরে ঢুকে গেলো।

কিছুটা সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকেই আবার অন্য একটি বিশেষ সুড়ঙ্গ দিয়ে—যাতে আড্ডার কেউ দেখতে না পারে—একেবারে মলিকে নিয়ে ঢুকলো যৌবন ঠাসা কুহকিনী নর্তকী কুহ্‌লির ঘরে। কারণ কালিঞ্জা জানতো কুহ্‌লির ঘর এখন ফাঁকা।

এদিকে ঠিকই কুহলি তখন আড্ডার নাচঘরে বেপরোয়া ভাবে নাচছে গাইছে মদ খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে এমন এক একখানা হাসি ছুঁড়ে দিচ্ছে না—দেখলে দেমাক খারাপ হয়ে যাবে যে কোন লোকের। আর কালিঞ্জার অন্যান্য সাকরেদরাও মাতাল হয়ে কেউ বাহবা দিচ্ছে, কেউ হাততালি দিচ্ছে, কেউবা দিচ্ছে জোর সিটি। কুহ্‌লির ঘর থেকেও কালিঞ্জা তার আওয়াজ পাচ্ছে।

কুহ্‌লির ঘরে নিয়ে কালিঞ্জা মলির চোখে মুখে দ্রুত জলের ঝাপটা দিলো। পরপর কয়েকবার ঝাপটা দিতেই মলি চোখ মেলে চাইলো এবং সামনে কালিঞ্জাকে দেখে হঠাৎ উঠে বসে চিৎকার করে উঠলো—এ আমায় কোথায় নিয়ে এসেছিস্ শয়তান! ভালোচাস্ তো ছেড়ে দে আমায়।

তারপর কালিঞ্জার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমন করলো মলি।

মলির আক্রমণে কালিঞ্জার কিছুই হলোনা। বরং রেগে গিয়ে কালিঞ্জা বললো—ছেড়ে দেবার জন্য তোমায় আনিনি সুন্দরী। অনেকদিন ধরেই তোমার আশায় ওৎপেতে ছিলাম। তোমাকে আমার চাই-ই। আমার নাম কালিঞ্জা সর্দার। যা চাই তা-ই পাই।

তারপর সে জোর করে মলিকে ধরলো। টানা হ্যাচরাতে মলির পরনের কাপড়ের আঁচলের খানিকটা ছিঁড়ে গেলো। কালিঞ্জা তাকে

কব্জা করার চেষ্টা করতে লাগলো আসুরিক শক্তিতে।

মলিও দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা দিতে লাগলো এবং নিজেকে রক্ষা করতে লাগলো প্রাণপনে।

ফুলের মত নরম নারীরাও সত্যিকারের প্রয়োজনে ও ইজ্জত রক্ষার্থে পাথরের মতো কঠিন ও শক্ত হতে পারে বৈ কি।

······এরকম ধস্তাধস্তি চললো অনেক্ষণ। একবার মলি ছিটকে পড়ল দূরে।

মলি হাতের সামনে যা পেলো ছুঁড়ে মারলো। তাতে কালিঞ্জার কপাল কিছুটা ছড়ে গেলো।

অবশেষে এবার মলি ক্লান্ত, অর্ধ বিবস্ত্র।······

তার যৌবন পুষ্ট দেহের প্রতিটি ভাঁজ কালিঞ্জার চোখের সামনে ঢেউ খেলছে। আর কালিঞ্জার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে এক পৈশাচিক কামনার বিভৎস উল্লাস।

ক্রুদ্ধ আক্রোশে কালিঞ্জা এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো মলির উপর।

মলি আর্তচিৎকার করে উঠলো বাঁচাও বাঁচাও। কিন্তু ততক্ষণে কালিঞ্জা তার বাম হাতে ঝাপটে সবলে চেপে ধরলে মলিকে। আর ডান হাতে কামোন্মত্ত কালিঞ্জা—সর্দার ঈগলের থাবার মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে মলির সুডৌল নরম মাংস পিণ্ড।

এমন সময় হঠাৎ দরজা খুলে নাচের পোষাকেই ঢুকলো কুহ্‌লি তার ঘরে।

কুহ্‌লিকে দেখেই থম্‌কে দাঁড়ায় কালিঞ্জা। থম্‌কে দাঁড়িয়ে যায় কুহলিও আশ্চর্য হয়ে। কিন্তু এই ফাঁকে ছিট্‌কে সরে যায় মলি ঘরের এক কোনে। রাগে ফুসে কুহলি কালিঞ্জাকে বাঘিনীর মতো ক্রুদ্ধ গলায় চিৎকার করে বলে—কালিঞ্জা সর্দার, তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে, বাইরে যা কিছুই করনা কেনো, আমার নিজের ঘরে কোন মেয়ে নিয়ে এসে কোনদিন কোনো মতেই মাতলামি করবে না বা ধর্ষণ করবে না।

কালিঙ্গাও সমান তালে চিৎকার করে বলে—এখন সে কথা মানি না। আমার যা খুশী করবো। এবং বলেই আবার মলির দিকে অগ্রসর হয় সে।

ঝটকরে দেওয়ালের চোরা কুঠুরী হতে একটা সাইলেন্সার লাগানো কালো চক্‌চকে কোল্ট ফরটি ফাইভ পিস্তল বের করে কুহ্‌লিও বলে উঠলো—খামোশ্‌ কালিঙ্গা সর্দার! আমিও ক্রুদ্ধ সাপিনী এবার। একপা এগুবে তো সব কটা গরম সিসের বুলেট তোমার সারা দেহে বিঁধিয়ে দেবো। আমিও আদিবাসী টিপরাইয়া মেয়ে। উষ্ণ বন্য জামাতিয়া রক্ত আমার শিরায় শিরায়, যদিও লেখাপড়া শিখে কিছুটা কালচারর্ড হয়েছি মিশনারী কন্‌ভেণ্টে।

আর শোন—এই আড্ডার বাইরে বড় সর্দার তুমি, আর ভিতরে বড় সর্দার হচ্ছি আমি। এটাই ছিলো আমাদের চোরাকারবারীর পার্টনারশিপের মূল চুক্তি। আমাদের সাক্‌রেদরা না জানলেও তুমি এটা ভালো করেই জানো।

তারপর একটু থেমে গলার স্বরটা সুঁচের মতো তীক্ষ্ণ করে—যাতে কালিঙ্গার কলিজায় গিয়ে বিঁধে—বললো কুহলি, খবর রাখো কি কালিঙ্গা সর্দার ওয়াটগঞ্জের রাস্তায়, ডকের আনাচে কানাচে, আজ-কাল হঠাৎ কতো খোচর ঘুরে বেড়াচ্ছে? আমাদের দুজন সাকরেদ আজ ধরাও পড়েছে পুলিশের হাতে। থানার বড় বাবুও গেছে পাল্টে, আর ছোটবাবুও গেছে বদলি হয়ে কাজে গাফিলতির দায়ে!

কুহলির চুক্তির কথায় বিশেষ করে পুলিশের উল্লেখ ও সদ্য দু'জন ধরা পড়ার ঘটনায় কালিঙ্গা সর্দার সাময়িকভাবে দমে যায়। তবুও মুখে বললো—আচ্ছা, তোমাকে ও পুলিশকে দু'জনকেই সময় হলে দেখে নেবো।

তারপর রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে চলে গেলো কালিঙ্গা সর্দার, তার গরম দেহের খোরাক নরম দেহের মলিকে হাতের মুঠোয় পেয়েও।

কুহলি এবার মলির নিকট এসে স্বাভাবিক ভাবেই মিষ্টি গলায় বললো—আপনার নাম ?

মলি রায়। মলি তখনও হাঁপাচ্ছে। তার চোখেমুখে তখনও আতঙ্কের ছাপ।

ভয় নেই সিষ্টার। আপনার কোন ভয় নেই। ভ্যাগিস্ শরীরটা ভালো না লাগায় আমি একটু আগেই এসে পড়েছিলাম। কোথা থেকে নিয়ে এসেছিলো আপনাকে

আউটট্রাম ঘাট থেকে।

কি ভাবে ?

মুখে হাত চাপা দিয়ে আর মাথায় পিস্তলের বাট দিয়ে আঘাত করে।

হাউ স্ট্রেঞ্জ। ছাট্ ইজ স্যুয়াইন কালিঙ্গা। দাঁত চেপে কুহলি কথাগুলো বললো।

আপনি আমায় বাঁচান বোন। আপনিও তো আমারই মত মেয়ে।

নিশ্চয়ই বাঁচাবো। সেই জন্যেই তো গড আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমার তো এখন আসার কথাই ছিলোনা।

কুহলির কথা শুনে মলি শুধু অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এই পরিবেশে মলি এরূপ ব্যবহার আশা করেনি : কুহলিও আচ করলো ব্যাপারটা। তাই একটু ভেবে কুহলি বললো—কথা বলার আর সময় নেই। নিজের কানেই তো শুনলেন সব। আমি এখন খুবই ব্যস্ত। চলুন আপনাকে সেখানে পৌছে দিয়ে আসি। তারপর যদি কোন দিন দেখা হয়—তবে এই পরিবেশে নয়, ভাল পরিবেশে—তখন না হয় মন খুলে দুজনায় কিছু কথা বলা যাবে।

আর যদি দেখা না হয়—বললে মলি।

তবে এখানেই শেষ—মৃদু হেসে ঘাড়টি কাত করে বললে কুহলি। কিন্তু আর দেরীও নয় কথাও নয়। জায়গাটাতো খুব ভালো নয়।

আমিও ভীষণ ব্যস্ত ;- চলুন চলুন।

মলিকে একরকম টেনেই নিয়ে চললো কুহলি। যেতে যেতেই একটা নিশ্বাস ফেলে বললে কুহ্লি—দেহটা আমার নষ্ট হয়ে গেছে অনেক আগেই কিন্তু মনটা এখনও মরে নি। তাই-থ্যাঙ্ক গড্—আপনি বেঁচে গেলেন। আমিও মেয়েছেলে ছিলাম, এখনও হয়ত কিছুটা আছি। আপনি কি বলেন? বলেই কুহ্লি মলির চোখের দিকে তাকালো। এবং অবাক হয়ে দেখলো মলির চোখ হতে দু'ফোটা জল ঝরে পড়লো।

১৩

মেসার্স মর্ডান ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড মেটাল আর্ট কোম্পানীতে নাইট শিফ্টে কাজ হচ্ছে।

মলি আউটট্রাম ঘাট হতে কুহলির নিকট বিদায় নিয়ে একটা ট্যাক্সি করে সোজা কারখানার কোয়ার্টারে চলে এলো। রাত তখন কাটায় কাটায় সাড়ে নটা বাজে।

সে বেশভূষা চট্পট্ পরিবর্তন করলো। বাড়ীতে মার কাছে ফোন করে মা-বাবার খবর নিলো। এ ঘটনার কথা কিন্তু কিছুই বললো না। বললে মা বাবা এ নিয়ে বিরাট একটা হৈ হৈ বাধিয়ে দেবে। তাছাড়া তার তো কোন ক্ষতি হয় নি। এসব ভেবে সে চুপ করেই রইলো।

তারপর এলো রূপকের সাথে দেখা করতে কারখানায়। রূপকের খোঁজ নিলো। সঠিক কেউ কিছু বলতে পারলো না। ম্যানেজারও না।

ডাক পড়লো রঞ্জুর। রঞ্জুকে সাহেব অনেক সময় অনেক কথা বলে। সে কথা মলি জানে।

রঞ্জু বললো—সাহেবদা মাত্র ঘণ্টা খানেক আগে লরী লুটের মালের হদিশের কথা ডেকে বলেছিলো। একটু দূরে তখন লছমনও

কাজ করছিলো।

সাহেব বলছিলো—প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভরা নাকি বলেছেন যে মালটা ডক এলাকার কালিঙ্গা সর্দার লুট করেছে আমাদের ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বী বেঙ্গল ষ্টীলের প্রপাইটর হরেরাম বাবুর প্ররোচনায়। এই হরেরাম বাবু যে আড়াল থেকে কাঠি নেড়ে কিছু রাজনৈতিক নেতাকে লেলিয়ে দিয়ে আমাদের কোম্পানীর শ্রমিকদের একাংশকে বিক্ষুব্ধ করে প্রায় ষ্ট্রাইক করানোর উপক্রম করেছিলো তাতো আপনি জানেনেই। আর কালিঙ্গা নাকি হরেরামবাবুর নিকট হ'তে প্রচুর টাকাও পেয়েছে। এই কথা বলার একটু পরেই সাহেব দা বেরিয়ে গেলেন। সাহেবদাকে খুব রাগী রাগী দেখাচ্ছিলো মেম দিদিমনি।

সর্দার কালিঙ্গার নাম শুনেই মলি আঁত্‌কে উঠল এবং বললো কি সর্বনাশ। কালিঙ্গা সর্দার যে বড় ভয়ানক লোক। রূপক একাই সেখানে যায়নি তো? পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে?

উত্তরের অপেক্ষা না করে মলি সাথে সাথেই ফোন তুললো।··· ···হ্যালো······হ্যালো······পুলিশ কমিশনার?·· ···মেসার্স মডার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড মেটাল আর্ট কোম্পানীর প্রোপাইটর বলছি······ শুনুন।—আমাদের লরি লুটের মালের একটা হদিশ এই মাত্র পাওয়া গেছে। শুনছি মালাটা নাকি কালিঙ্গা সর্দারের লোকেরা লুট করেছে। সঙ্গে কালিঙ্গাও ছিলো। আর এ দিকে রূপকও কারখানায় নেই। আমার মনে হয় প্রাইভেট্‌ ডিকেট্‌টিভদের নিকট খবর পেয়ে রূপকও কালিঙ্গার খোঁজে গেছে। এটা অবশ্য আমার অনুমান। যা একরোখা লোক।

মলি এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল। কমিশনার সাহেব বললেন—আমরাও একটু আগেই গোয়েন্দা মারফৎ খবর পেলাম যে ওটা কালিঙ্গারই কাজ। লোকটা খুবই ধূর্ত। ব্যবসার আড়ালে চোরা কারবার করে। তাকে টাকা জোগায় কয়েকজন ধনী ব্যবসায়ী। কালিঙ্গার সাথে তাদের গোপন একটা চুক্তি আছে

এবং ডক এলাকায়ই এদের আণ্ডারগ্রাউণ্ড বাড়ীতে এসব চলে। আমরা আড্ডাটা এখনই রেড করতে যাচ্ছি।

একটু অপেক্ষা করুন। সম্ভব হ'লে আমরাও সংগে যাবো এবং যেতে যেতে কালিঙ্গা সম্পর্কে আপনাকে আমি কিছু নতুন খবরও দিতে পারবো।

নতুন খবর ?···ঠিক আছে···তবে তাড়াতাড়ি চলে আসুন······।

কমিশনার সাহেব ফোন ছেড়ে দিলেন। ছেড়ে দিল মলিও। তারপর মলি রঞ্জু ও লছমনদের সঙ্গে নিয়ে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে লাল-বাজার এল।······এসে দেখে পুলিশ রেডি।

পুলিশের গাড়িগুলি চলল খিদিরপুরের দিকে ডেপুটি কমিশনার মিঃ দেব রায়ের নেতৃত্বে। যেতে যেতে কমিশনার মলির মুখে সব শুনে ড্রাইভারকে আরও দ্রুত গাড়ি চালাতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ দিলেন ওয়ারলেস মারফৎ অন্যান্য অফিসার দিগকেও।

চৌদ্দ

সাধারণতঃ রূপকের প্রকৃতি তার মায়ের মতই ঠাণ্ডা। কিন্তু তার শরীরে আছে যুদ্ধবাজ পিতার খুন, যে পিতা যুদ্ধে কোনদিন পশ্চাৎ অপসরণ করেননি।

তাই কালিঙ্গার খবর পেয়ে হঠাৎ তার মাথায় খুন চড়ে গেলো। ভুলে গেলো সে যে একটা কারখানার মালিক।

সে সাথে সাথেই রঞ্জুকে খবরের সামান্যটা বলে একাই লুকিয়ে প্রচুর গুলিসহ পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

তারপর কালিঙ্গার আড্ডায় বাগান বাড়ার দিক দিয়ে ঢুকলো। দারোয়ান রূপককে একদিন কালিঙ্গা ও সাধুজীর সাথে দেখেছিলো। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে সেলাম ঠুকে সরে দাঁড়ালো। রূপক ছোট দরজার সামনে গিয়ে বোতাম টিপলো।

গ—ড়্—ড়্ গ—ড়্—ড়্ করে দেওয়াল সরে গুপ্ত সিঁড়ি বের

হলো। সামনে নতুন দারোয়ান। বাধা দিলো। গুড়ুম্ করে গুলি ছুটলো দারোয়ানের কপাল ভেদ করে। লুটিয়ে পড়তে পড়তে দারোয়ান পাগলা ঘন্টা বাজিয়ে দিলো।

আর ঠিক রূপকের পিছনেই সে সময় দেখা গেলো সাধুবাবার আবছা মূর্ত্তি। যেন অলক্ষ্য থেকে সাধুজী রূপককে রক্ষা করছে।

আর দেখা গেলো সিঁড়ির ঠিক নিচের মুখে তিনজন ষণ্ডা মার্কা গুণ্ডা। ঘন্টার আওয়াজ পেয়ে আরও লোকজন ছুটে আসছে।

রূপক লাফ দিলো উপর হতে। ক্যারাটের দুই আঘাতে দু'জন কাৎ। চকিতে একটা বড় ছুরি বার করলো তৃতীয় ব্যক্তি। পিস্তল ছুটল রূপকের। লুটিয়ে পড়লো তৃতীয়জনও।

আলোর বাল্ব কয়েকটা ভেঙ্গে দিলো রূপক তার সুবিধার জন্য। নতুবা একা একা এত লোকের সাথে সুবিধা হবে না। আর দাঁড়ালও একটা বড় কাঠের বাক্সের আড়ালে।

অপর পক্ষ হতেও এতক্ষণে গুলি ছুটলো। রূপকের কানের পাশ দিয়ে একটা গুলি চলে গেলো। রূপক একটা কাঠের বাক্সের পেটি ছুঁড়ে মারলো। দু'জন মস্তান একসাথেই কুপোকাত।

হঠাৎ পেছনে ছোরা হাতে লাফিয়ে পড়লো দুজন রূপকের উপর। একজনকে 'মডেষ্টি ব্লেইজ' টাইপের লাথিতে কাৎ করে অপর জনকে দিলো কুং—ফুর এক ওস্তাদী মার। ছোরা ছিট্‌কে পড়লো।

এবারে ধস্তাধস্তিতে হাতের মাদুলিটা ছিড়ে পড়ে গেলো রূপকের। সর্বনাশ। রূপক দেখলো মাদুলিটা। ঝাঁপিয়ে পড়ে মাদুলিটা তুলতেও গেলো হাত দিয়ে। কিন্তু তখনই পাশ থেকে আক্রমণ করলো কয়েকজন।

ঘুষি, জুডো, ক্যারাটে কুংফু লাথি পিস্তল যখন যা প্রয়োজন সমানে চালালো রূপক। এখনকার রূপক যেনো আখড়ার সেই চ্যাম্পিয়ান রূপক। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে রূপকের ব্যায়াম করা পেশী বহুল শরীরটাও।

কিন্তু ক্লান্ত হলেতো চলবে না। আবার ভাবলো একা একা হয়তো এরূপভাবে হুটকরে চলে আসাটা ঠিক হয়নি। সাধুবাবার কথা মনে হলো—"মাদুলি না থাকলেই বিপদ"।

সুতরাং মাদুলিটা তার চাই-ই। আর চাই কালিঙ্গা সর্দারকে।

কিন্তু কিছুতেই সে মাদুলিটার কাছে পৌঁছাতে পারছে না। রূপক শেষ বারের মতো সমস্ত শক্তি একত্র করে আক্রমণ করলো।

কতো কাচের জার ভাঙ্গলো। ভাঙ্গলো কত বাক্স, মদের বোতল, স্পিরিটের বোতল, তার হিসাব নেই।

রূপকের কিছুটা সুবিধে হলো এজন্য যে বিপক্ষ পার্টির বেশীর ভাগই মদের নেশায় বেসামাল। তাতে চলছিলো আবার ভেতরের ডায়াসে কুহলির বুক খোলা, নাভি দেখানো নাচ। নাচ শেষ হলেও, নাচের সেই দৃশ্যাবলী ও গানের সেই চটুল কলি আর সুরগুলিই তাদের মাথায় ঘুর ঘুর করছিলো তখনো।

এসব ঘটনাবলী কিন্তু ঘটে যাচ্ছে দ্রুত।

……এদিকে পুলিশের গাড়ি গঙ্গার ধার দিয়ে এসে সুড়ঙ্গের কাছে দাঁড়ালো। দেখলো সুড়ঙ্গের মুখ ভেতর হতে বন্ধ। পুলিশ চার্জ করে মুখ ভেঙ্গে দিলো সুড়ঙ্গের।

আর একদল পুলিশ বাগানবাড়ীর গেট দিয়ে ঢুকলো ভেতরে। দু'দিক হতে আক্রমণ করলো পুলিশ।

এবার সমগ্র এলাকা জুড়ে পুলিশ ও গুণ্ডাদের মধ্যে লড়াই লেগে গেলো ভীষণ। এবারের লড়াইয়ে কালিঙ্গা সর্দার নিজেও আছে। আর আছে কুহলি। রূপকের সাথে এতক্ষণ লড়াই করছিলো সাকরেদরাই।

উভয় পক্ষই বন্দুক পিস্তল স্মোক বোম্ব ইত্যাদি ব্যবহার করছে। ক্লান্ত রূপক পুলিশ ও মলিকে দেখে দ্বিগুন উৎসাহে লড়াই শুরু করলো।

মলি "রূপক রূপক আমরা এসে গেছি"—বলে চিৎকার করতে

করতে ছুটে আসছে রূপকের দিকে। রূপক চেঁচিয়ে সাবধান করলো তাকে। ডেপুটি কমিশনার সাহেব দেখলেন ইহা।

ওদিকে কালিঙ্গা সর্দারের হাতের পিস্তলও ঘন ঘন গর্জন করে উঠছে। হঠাৎ মলিকে দেখেই আঁৎকে উঠলো কালিঙ্গা সর্দার। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। সাধুজীর কথা মনে পড়লো তার— "জোর করে কোন মেয়েকে ধর্ষণ করতে চাইলেই বিপদ"।

ইতিমধ্যে লড়াইয়ে কালিঙ্গার পক্ষে অনেক লোক হতাহত হয়েছে। কিছুটা আহত হয়েছে রূপকও, আর আহত হয়েছে কয়েকজন পুলিশও।

মলির চেঁচানোতে কালিঙ্গা পূর্ব পরিচিত রূপককে এবার স্পষ্ট দেখতে পেলো। দেখেই ধরে নিলো রূপক পুলিশের একজন স্পাই এবং সে-ই পুলিশকে খবরাখবর দিয়েছে। সেই জন্যই আশ্রম হতে সাধুজীর সাথে এসে সেদিন ঘাঁটিটা দেখে গিয়েছিলো।

কালিঙ্গা তাই মরিয়া হয়ে সামান্য উঁচু একটা বারান্দা থেকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছিলো। এবার থামের আড়াল হতে নিশানা করলো রূপককে। ছুটন্ত মলি তা দেখতে পেলো। দেখতে পেলেন ডেপুটি কমিশনার মিঃ দেব রায়ও।

মলি ঝাঁপিয়ে পড়লো রূপকের সামনে রূপককে রক্ষা করতে, আর কালিঙ্গার গুলিও ছুটলো ঠিক তখনই। গুলি বিঁধলো মলির ডান কাঁধে।

আঃ আঃ করে চিৎকার করেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো মলি।

ওদিকে সঙ্গে সঙ্গেই কমিশনারের এক ঝাঁক গুলি বিদ্ধ করলো কালিঙ্গা সর্দারকে।

ভীষণ চিৎকার করে পড়ে গেলো কালিঙ্গা। কয়েকবার ছটফট করলো। মুখটা যন্ত্রণায় বেঁকে গেলো একদিকে। তারপর একটা বড় ঝাপটা দিয়েই স্থির হয়ে গেলো কালিঙ্গার দেহটা। সব শেষ খেল খতম।

কালিঙ্গার চিৎকারে ছুটে এলো কুহলি কালিঙ্গার দিকে। তারও ডান হাতে পিস্তল, বাম হাতে গুলি বিদ্ধ। তাতে রক্ত ঝরছে। দেখলো কালিঙ্গা মৃত।

ডেপুটি কমিশনার চেঁচিয়ে বললেন—আত্মসমর্পন কর সবাই। কুহলি বুঝলো আর লড়াই চালানো বৃথা। তাতে তাদের দলের লোকের মৃতের সংখ্যাই শুধু বাড়বে। অযথা মৃত্যু তার কাম্য নয়।

কুহলি পিস্তল পুলিশের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে বললো—ডি. সি. সাহেব আমরা আত্মসমর্পন করছি। আর আমার লোকেরা যে যেখানে আছো বেরিয়ে এসো। অস্ত্র সমর্পন করে হাত তুলে দাঁড়াও।

তারপর কুহলি কালিঙ্গার মাথাটা সযত্নে কোলে তুলে বসলো। মৃত কালিঙ্গার মাথাটায় হাত বুলাতে লাগল মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে। কাপড়ের আঁচল দিয়ে রক্তগুলি আলতো ভাবে মুছে দিতে লাগলো দেহের বিভিন্ন স্থান হতে। চোখের কোনে চিক্ চিক্ করছে তার একফোটা জল। কিন্তু দক্ষ সেনানীর মতো সামলে নিলো। এই মুহুর্তে সে দল নেত্রী, তাই চোখের জলকে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে দিলো না।

রূপক কিন্তু এতো কিছুর মধ্যেও এক ফাঁকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে গিয়ে খুঁজে খুঁজে একটা ভাঙ্গা বাক্সের কাছে তার মাদুলিটা খুঁজে নিয়ে এসেছিলো।

কালিঙ্গার সাকরেদরা একে একে এসে সবাই আত্মসমর্পন করলো। পুলিশ বন্দী করলো সবাইকে।

মলিকে নিয়ে বসে আছে রূপক। কালিঙ্গাকে নিয়ে বসে আছে কুহলি। একজন একতলায় অন্যজন উঁচু বারান্দায়।

লড়াইয়ে আহত ও নিহত দেহগুলিকে এম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে পাঠাতে আদেশ দিলেন পুলিশ সাহেব। আর একজন পুলিশ অফি-সারকে জলদি ওয়ারলেসে এম্বুলেন্স পাঠাতে খবর দিতে বললেন।

পুলিশ সাহেব এবার গেলেন রূপকের কাছে। রূপককে সমবেদনা জানালেন। বললেন মলিদেবীকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

রূপক কান্না ভেজানো গলায় বললো—মিঃ দেবরায় আপনি এগোন। আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি, এম্বুলেন্সও এলো বলে। তাছাড়া রঞ্জু, বীতেশ ও পুলিশেরা তো রইলই এখানে।

রূপক ও মলির চার পাশে দাঁড়ালো রঞ্জু বীতেশ, লছমন ও আরও অনেকে। সবারই চোখ জলে ভরা।

রূপক মলির মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল—সবকিছু করেও শেষ রক্ষা করতে পারলে না মলি। কেন তুমি এভাবে এখানে এসেছিলে?

মলির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। জল পড়ছে রূপকেরও দুই গাল বেয়ে। যন্ত্রনায় কিছুটা কাতরাচ্ছে মলি মাঝে মাঝে। ছট্-ফট্ও করছে। আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে মলি।

রূপক—দুই হাত দিয়ে মলির হাতটা ধরলো। মলির ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো। মলি জ্ঞান হারালো।

সঙ্গে সঙ্গে এম্বুলেন্স এলো। মলিকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

মলি আর কুহলি এতো কাছাকাছি থেকেও কেউ কাউকে দেখলোওনা চিনলোওনা। আর কোন দিন বলাও হলো না প্রথম দিনে মলিকে কুহলির বলা সেই—"মন—খুলে দুজনার কিছু কথা।"

১৫

হাসপাতাল। অপারেশন করে গুলি বের করা হয়েছে মলির। আঘাত ততোখানি গুরুতর নয়। তবে একেবারে সামান্যও নয়। আঘাতের চেয়ে ভয়ই বেশী পেয়েছিলো মলি।

অচেতন অবস্থায় মলি বিড়্বিড় করছে মাঝে মাঝে। অঘোর অচৈতন্য মলি স্বপ্ন দেখছে,—কত কিছুর স্বপ্ন, কতো ধরনের স্বপ্ন।

···এবার ক্লান্ত শ্রান্ত রূপক মৃত মলির দেহটাকে দু'হাত দিয়ে পাজাকোলে করে ধরে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে উপরে এসে গঙ্গার ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে।

আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি আসছে, অঝোর ধারায় ঝরছে বৃষ্টি। প্রবল বর্ষণে রূপকের সারা অঙ্গ ধুয়ে মুছে ক্লান্তি শ্রান্তি ধীরে ধীরে বিদূরিত হচ্ছে।

ভিজে চুলে চোখ মুখ ঢেকে যাচ্ছে তার। মলিরও সারা দেহে রূপকের ভিজে চুল বেয়ে জল পড়ছে টুপ্‌টাপ করে। ধুয়ে যাচ্ছে দেহের ক্ষতস্থানের রক্ত। রূপকের কোলে যেনো বিশ্রাম নিচ্ছে চঞ্চলা চপলা মেয়েটি।

রূপক ভাবছে—ও ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। ওকে কেউ জাগাবে না। তারপরই আবার চোখের জল বৃষ্টির জলের সাথে এক হয়ে রূপকের দুই গাল বেয়ে টুপ্‌টুপ্‌ করে ঝরে পড়ছে মলির বুকের উপর।

*　　*　　*　　*

সমাধি হয়ে গেছে মলির। ফুলে ফুলে—অজস্র রঙের ফুলে ফুলে—ঢেকে গেছে মলির সমাধিস্থান। কাঁদছে অলকাদেবী। কাঁদছে ধীরেনবাবু। কাঁদছে হেমাঙ্গিনী দেবী। কাঁদছে রঞ্জু, বীতেশ, আয়েষা, পম্পি কারখানার সবাই।

···সমাধি হতে ফিরে কারখানায় গিয়ে রূপক ধীরে ধীরে গোদরেজের আলমারিটা খুললো। নিলো সব দলিল পত্র। আর নিলো কাগজে প্যাকেট করে মাদুলিটি। তারপর চিন্তা ক্লিষ্ট মনে চললো সাধুর আশ্রমের দিকে।

রাস্তায় যেতে যেতে যেনো আনমনে ভাবতে লাগলো রূপক—লেখাপড়া শিখে ও সেই দেশের গ্রাম ছেড়ে—কি যেনো গ্রামের নামটা···ছ···শ্যামল গাও—কোলকাতায় এসে মনের ও পেশীর জোরে শেষ পর্যন্ত রিকশা চালিয়ে ভদ্রভাবে জীবনের মোড় ঘুরাতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম একটু সুখ, একটু স্বচ্ছন্দ। ভদ্রভাবে

বাঁচার মতো একটা আস্তানা, সুখের নীড়। পাইনি।

রিকশা চালাতে চালাতে ভদ্রব্যবহার যেমন পেয়েছি, অভদ্র ব্যবহার ও তো কম পাইনি। বরং তুলনা করলে অভদ্র ব্যবহারের পাল্লাই বেশী ভারি হবে। আর ওই সব অভদ্র ব্যবহার করেছে তথাকপিত ভদ্রবেশী শহুরে কেতাবী শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাই।

তারপর এলো সাধুবাবার মাদুলী। ঝুঁকলাম ভাগ্যের দিকে। চিরাচরিত কুসংস্কারের দিকে। এলো লটারীর টাকা। হয়তো ভাগ্যের দান। নিজেকে বিকশিত করার একটা নিশানা। একটা আলোর সন্ধান যেনো পেলাম। ঝাঁপিয়ে পড়লাম কারখানার দিকে। পারিশ্রম করলাম প্রচুর। দাঁড়ালো কারখানা। পরিশ্রমের ফল পেলাম।

পেলাম মলিকে। পেলাম একটা নতুন দিগন্তে নতুন ইশারাকে। রূপক ও মলি। এক নাম এক কাম। একটা সুন্দর স্বপ্ন—একটা সুখের নীড়। এক বৃন্তে যেনো টাটকা তাজা দু'টো সুগন্ধ পুষ্প।

কিন্তু সেখানেও ওই আধুনিক সমাজের সৃষ্টি সামাজিক পোকা-গুলিই বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। জানি, দু'হাত দিয়ে ওই সব বাঁধা বিঘ্নকে দূরে ঠেলে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু মলি যে নেই! আমার প্রেরনা। আমার প্রাণের মূল উৎস!

মলি, আমার এমন হচ্ছে কেন? আমার মনে জড়তা এসে গেছে কি? প্রাণের উৎস ফুরিয়ে যাচ্ছে? নাকি ইহা সাময়িক অবসাদ?

কিন্তু মলির জন্যই এই জড়তা, এই অবসাদকে আমার কাটাতে হবে।

এখন একটু বিশ্রাম চাই। দীর্ঘ চলার পথে একটু যতি, একটু ছেদ, তারপর আবার নতুন করে নতুন জীবনের পাঞ্জা কষে জীবনের জয় যাত্রাকে শাশ্বত সুন্দরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় সাধুজীর আশ্রমে এসে গেলো রূপক।

স্বপ্নের মলি দেখছে······

আশ্রমে গিয়ে রূপক সাধুবাবাকে বললো—সাধুজী, এই নিন আপনার মাদুলি, এর ভার আর আমি বইতে পারছিনা। আর এই রইলো আমাদের কারখানার আমার পার্টনারশিপের সব দলিলপত্র। এখন হতে এই কারখানায় আমার নামের সব কিছু আপনার।

সাধুজী নির্বাক হয়ে শুধু তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর রূপক বললো—আপনাকে কিছুই করতে হবে না। রঞ্জু, পম্পি, লছমন আয়েসা ও বীতেশকে ট্রাষ্টি করে আমি সব কিছু বুঝিয়ে বলে গেছি।

যাকে ঘিরে এতো সব কিছু হয়ে ছিলো, যে ছিলো এই কারখানার আসল রূপকার, যাকে নিয়ে ছিলো আমার ধ্যান কল্পনা, সবকিছু স্বপ্ন, সে-ই যখন রইলো না, তখন এসবে আর কি হবে? আমাকে একটু বিশ্রাম নিতে দিন। মলিই যখন নেই তখন আর আমার কিছুই নেই।

এই কথা কয়টি বলেই এবং সাধুজীকে উত্তরের কোন সুযোগ না দিয়েই রূপক ধীরে ধীরে চলে গেলো আশ্রম ছেড়ে। যেনো এই কথাগুলি বলার জন্যই সে আশ্রমে এসেছিলো এবং বলা শেষ হওয়া মাত্রই চলে গেলো।

······চলে যাচ্ছে রূপক। চলে যাচ্ছে দূর হতে দূরে, আরও দূরে, আরও আরও দূরে।·········

····· এক সময় তার দেহটা অন্ধকারে আবছা হতে হতে ক্রমে মিলিয়ে গেলো······।

ষোল

"যেওনা রূপক, এই তো আমি—আমি মলি—তোমার মলি।" বলে হাসপাতালের বেডে চেঁচিয়ে উঠে মলি প্রায় বসে পড়লো।

ছুটে এলো নার্স। ছুটে এলো ডাক্তার। এলো অপেক্ষারত রূপক, ধীরেনবাবু, অলকাদেবী, হেমাঙ্গিনী দেবী ও আরো অনেকে।

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে মলির। মলির জ্ঞান ফিরেছে। নার্স ডাক্তার ব্যস্তভাবে বললেন—মলি দেবী উঠবেন না, উঠবেন না—শুয়ে পড়ুন।

মলি শুয়ে পড়লো। তারপর বললে—আমি কোথায়?

হাসপাতালে আছেন ও ভালোই আছেন। বললেন ডাক্তারবাবু।

মা কোথায়?

ধীরেনবাবু ও অলকাদেবী কাছে এসে বললেন—এই তো আমরা খুকি, এইতো।

অলকাদেবী বললেন—খুব কষ্ট হচ্ছে মা?

মলি উত্তর দিলো—কাঁধের কাছটায় একটু চিন্ চিন্ করে ব্যথা করছে।

তারপর আস্তে আস্তে মলি বললে—রূপক কোথায়?

এই তো আমি মলি—পাশ থেকে কথা ক'টি বলেই রূপক মলির কাছে এলো।

মলি মৃদু হাসলো। হাসলো রূপকও।

মলির দৃষ্টি হেমাঙ্গিনীদেবীর দিকে পড়তেই হেমাঙ্গিনীদেবী কাছে এসে মলির চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন। সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিলেন মলির কপালে ও গালে।

নার্স সবাইকে বাইরে যেতে অনুরোধ করলেন। বললেন—পেশেণ্ট এখনও খুব দুর্বল। বেশী কথা বলাবেন না। ভীড় করবেন না।

সবাই বাইরে চলে গেলো। চলে গেলো আয়েষা, পম্পি, ঝুম্‌কিও।

বীতেশ রঞ্জুরা বাইরে গিয়েও কিন্তু জানালার পাশ দিয়ে এক আধবার উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিলো।

ডাক্তারবাবু এক ফাঁকে বাইরে গিয়ে রূপক ও ধীরেনবাবুকে বললেন—আর ভয়ের কিছু নেই। যদিও মেজর আপারেশন নয়, তবু কয়েকটাদিন একটু সাবধানে রাখতে হবে।

মলি আবার মৃদু কণ্ঠে রূপকে ডাকলো। নার্স রূপককে ডেকে দিলো এবং একটু দূরে সরে গেলো।

রূপক এলো। পাশে বসলো।

রূপক মলির কপালের উষ্ণতা হাত দিয়ে পরীক্ষা করার অছিলায় কপালে হাত রাখলো।

মলি দুর্বল হাতে সেই হাত তার দু'হাত দিয়ে ধরে রাখলো এবং চক্ষু বুজে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

কিছুক্ষণ পর অস্পষ্ট কণ্ঠে আবার বললো—কালিঙ্গারা আমাদের এতো কষ্ট করে তৈরী, এতো স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা রানিং ব্যবসায় হেচোট্ খাইয়ে আপাতত অনেকটা লস করে দিলোতো রূপক। এবং সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জুলি ও শেলীর—"রূপসী বালুরেখা" "অস্থির" "ক্ষণস্থায়ী"—ইত্যাদি কথাগুলিও তার মনে পড়ে গেলো।

ওসব কথা এখন থাক মলি। সময়ে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আগে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠো। বললো রূপক।

ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজা ঠেলে হঠাৎ সাধুবাবা ঘরে ঢুকলো। তারপর ওদের দু'জনের হাতের উপর নিজের করতল স্থাপন করে বললেন—"সুখী হও"।

মলি ও রূপক বিহ্বলের মতো পরস্পরের দিকে শুধু অপলক নয়নে চেয়ে এক সঙ্গে বলে উঠলো—সা—ধু—বা—বা।

তারপর উভয়ের মুখেই একটা মিষ্টি মৃদুহাসি ফুটে উঠলো।

*　　*　　*　　*

পরদিন। সন্ধ্যা হয় হয়। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবছে। সোনালি সূর্য।

সেই সূর্যের দিকে চেয়ে হাসপাতালের এক জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ক্লান্ত শ্রান্ত রূপক।

নিচের রাস্তায় একটু দূরে গঙ্গার পাড়ে দেখা গেলো দাঁড় করানো আছে একটা রিক্সা। পশ্চিমে নয়, পূব আকাশের দিকে তার মুখ। সেদিকে মুখ ফেরালো রূপক। তন্ময় হয়ে দেখলো রিক্সাটিকে। রূপক দেখলো পূর্ব দিগন্তে নতুন সূর্যের আলোর আশায় যেনো রিক্সাটি উন্মুখ।

আকাশে ছিলো মেঘ। মেঘ জমাট বাঁধলো। নামলো বৃষ্টি। প্রথম দিনের সেই মিষ্টি বৃষ্টি। বইলো হাওয়া। হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট লাগলো রূপকের চোখে, মুখে ও সারা গায়ে।

ভিজলো রূপক। ভিজলো রিক্সাটি। ভিজলো গাছ লতা পাতা। ভিজলো গঙ্গার পাড়ের নরম সবুজ ঘাস। নরম মাটি।

ভিজে ভিজে নতুন অঙ্কুরোদ্গমে যেন উন্মুখ হচ্ছে বিবশা ধরণী।

রূপক চেয়ে চেয়ে দেখছে আগামী দিনের নতুন পৃথিবীকে। আর মনে মনে কি তার সাথে মিলিয়ে নিচ্ছে—ওই যে বিছানায় শোয়া একতাল পাখির পালকের মতো নরম—ক্লান্ত শ্রান্ত মলিকে, মলি রায়কে, না মলি দত্ত কে?

—সমাপ্ত—